ভারত ও ভারতবাসী

[দশম শ্রেণী]

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন পাল, এম. এ. (ট্রিপল)

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ঐস্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আধুনিক ইতিহাস।

অধ্যাপক, শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া ; ভূতপূর্ব অধ্যাপক,

বি. বি. কলেজ, আসানসোল ও রামসদয়

কলেজ, আমতা, হাওড়া

অধ্যাপক সত্যজীবন চক্রবর

অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা ; প্রাক্তন অধ্যাপক, শ্রীচৈতন্য

কলেজ, হাবড়া ; আনন্দচন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি ;

মতিঝিল কলেজ, দমদম



৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
এইচ. এল. সাহা
পুথিপত্র
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন,
কলিকাতা-৯
১৯১৯

বিক্রয়কেন্দ্র :
পুথিপত্র
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
এস. সাহা
ক্যালকাটা প্রিন্টার্স
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

SYLLABUS FOR CLASS X

PART—B

History of Freedom Movement.

I. (a) Impact of western contact. Remarking of India : introduction of western education—intellectual reawakening, growth of Indian Nationalism. Impact of the ideas preached by Bankim Chandra and Vivekananda : economic exploitation of the people, educated unemployment, sense of unity fostered by easy means of communication, role of the Press, rediscovery of India, Urge towards responsible government. (10 pages)

(b) Political association from the Landholders' society to the Home Rule league. (3 pages)

(c) Indigo Agitation, protest against Arms Act and the Vernacular Press Act, Ilbert Bill controversy, leadership of Surendranath Banerjee. All India National Conference, 1883. (7 pages)

II. Foundation of the Indian National Congress, 1885. Its leaders and activities upto 1905. Changing role, Congress not destined to be Her Majesty's opposition : Growing discontent against the policy of 'Prayer and petition'. (6 pages)

III. Partition of Bengal (1905)—a challenge to Indian Nationlism. Swadeshi and Boycott Movement. Muslim Participation. National Education Movement. (8 pages)

IV. (a) Growth of militant nationalism. Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh, Bepin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai. (6 pages)

(b) Revolutionary struggle in Bengal, Maharashtra and the Punjab. (9 pages)

V. New leader : M. K. Gandhi. Aftermath of World War I. Disillusionment against the British and discontent against their measures of repression.

Jalianwalabagh Massacre. Gandhiji's concept of Satyagraha—non-violent Non-co-operation and Khilafat movements—a short history. (Congress divided : the Home Rule Movement ; the Swarajya Party : revival of Revolutionary extremism). (15 pages)

VI. New phase in the Freedom Movement : The Lahore Congress ; demand for complete independence under Jawaharlal Nehru's leadership, historical importance of the 26th January, British Policy of 'kicks and kisses'. Round Table Conferences. Civil Disobedience Movements. Role of Jinnah and Muslim League, Congress participation in Government—disillusionment. (20 pages)

VII. Impact of the Second World War. 'Quit India' and August Upsurge. Netaji and the I.N.A. Exploits of the Azad Hind Fauj. The Naval Revolt. Failure of British efforts at conciliation : Cripps Mission, Cabinet Mission. Interim Government. Transfer of Power—Indian Independence Act, 1947—creation of two Dominions—India and Pakistan. India as Republic (1950). (16 pages)

PART—C

. *Broad features of Indian Constitution.* (22 pages)

I. Independent India : Constituent Assembly : Making of the Constitution. Preamble, the National Flag, the National Anthem. Broad features of the Constitution (The Indian Union and the Constituent States and Union Territories. Parliament, the Union Executive), the Judiciary. The State Executive, Legislature and Judiciary.

II. The Electorate. Directive Principle of State Policy.

III. Fundamental Rights.

B. *Citizenship—Rights and Duties of the Citizen.* (3 pages)

ভূমিকা

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-কর্তৃক দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী রূপে নির্দিষ্ট। বিষয়টি জটিল ও ঘটনাবহুল। তদুপরি ইহা এখনও গবেষণার স্তর অতিক্রম করে নাই। মুক্তি আন্দোলনের অনেক ঘটনা-ই এখনও দূর অতীতের বিষয়ীভূত হয় নাই। নেতৃবৃন্দের মধ্যে এখনও অনেকেই জীবিত; সুতরাং সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ অসুবিধাজনক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পক্ষপাতশূন্য হইয়া এ পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে যে-সমস্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া পুস্তকটি রচনার প্রয়াস পাইয়াছি। পুস্তকটি যাহাতে অতিরিক্ত তথ্য ভারাক্রান্ত না হয় এবং সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিকে যাহাতে অযথা পীড়ন না করে, তজ্জন্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি পরিহার করিয়া মুক্তি আন্দোলনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ও নেতাদের কৃতিত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়াছি। পুস্তকটিকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য কংগ্রেসের সভাপতিগণের ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের দুষ্প্রাপ্য প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছি। পুস্তকের ভারতীয় শাসনতন্ত্র-বিষয়ক অংশটি লিখিয়াছেন বঙ্গবাসী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যজীবন চক্রবর্তী মহাশয়। শিক্ষক মহোদয়গণ ও ছাত্রগণ-কর্তৃক পুস্তকটি সাদরে গৃহীত হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

চিত্তরঞ্জন পাল

সূচীপত্র

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস

ভারতীয় সংবিধানের রূপ-রেখা

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

পাশ্চাত্য সংস্পর্শের প্রভাব ঃ ভারতের নবরূপায়ণ

অবতরণিকা ঃ ভারতে মুক্তি-আন্দোলনের সূচনা-কাল ঃ ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস মহাকাব্যের মত বিচিত্র, জটিল ও ঘটনাবহুল। শত শত শহীদের এবং খ্যাত-অখ্যাত দেশভক্তের আত্মদানে এই সংগ্রামের কাহিনী উজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত। শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর সংগ্রাম দৈত্যের বিরুদ্ধে বামনের সংগ্রামের মতই রোমাঞ্চকর ও কৌতূহল-উদ্রেককারী।

স্বাধীনতা দিবস

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভারতবাসী সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া যে-সংগ্রাম করিয়াছে তাহার অবসান সূচিত হয় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে। কিন্তু ভারতবাসীর গৌরব-উজ্জ্বল এই মুক্তি-আন্দোলনের কখন সূত্রপাত, ভারতবাসী ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়নের জন্য কবে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করে সে সম্পর্কে সঠিক উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। কয়েকজন লেখক মনে করেন যে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ-ই জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম।

মুক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত-সম্পর্কে বিতর্ক

আবার কোন কোন লেখক মনে করেন, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে যে-দিন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, সেই দিন হইতে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শুরু। আবার অনেকে মনে করেন, রামমোহন রায়ের সময় হইতে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সূচনা। আবার কেহ কেহ মনে করেন, ভারতের মুক্তি-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বান্দ্বিক কার্য-প্রক্রিয়া (Dialectical process)। ভারতের প্রাচীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি, নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পরে সমন্বয়ের পথে স্বাধীন ভারতের আত্মপ্রকাশ—ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এই ত্রিধাবিভক্ত কার্য-প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্ট সন-তারিখ দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। তথাপি বলা যাইতে পারে, ব্রিটিশ শক্তির আগমনে ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার

বিলুপ্তির সূচনার সময় হইতে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এই জটিল দ্বান্দ্বিক কার্য-প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের আরম্ভ।*১

পাশ্চাত্য শক্তির আগমনে ভারতে সংঘর্ষ ও ধ্বংসলীলা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের (ভারতীয়) ইতিহাস সংঘর্ষ, রক্তপাত, ধ্বংস ও অরাজকতার ইতিহাস। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পররাজ্যগ্রাসী নীতির ফলে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত

প্রাচীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিলোপ

একদা শক্তিশালী ভারতীয় রাজ্য ও রাজবংশসমূহ হয় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, না হয় শক্তিহান হইয়া ইংরেজদের অনুগত মিত্রে পরিণত হয়। ইংরেজ শক্তির আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতেব পল্লীসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট হইয়া যায়; ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং এই ভাঙনের মুখে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণ, বিদেশী অভিযান কম হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে সভ্যতার মুখোশ পরিয়া ইংরেজ-জাতি যে-নির্লজ্জ শোষণ ও লুণ্ঠন করিয়াছে তাহা পূর্ববর্তী আক্রমণ ও অভিযানকারীদের শোষণ ও লুণ্ঠনকে নিষ্প্রভ ও ম্লান করিয়া দিয়াছে।

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ভারত-সম্পর্কে লিখিত টীকা-টিপ্পনীর একটিতে কার্ল মার্ক্স লিখিয়াছিলেন যে, যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষে শত শত গৃহযুদ্ধ, অভিযান, বিপ্লব, বিজয় ও আক্রমণের ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনা সমাজের উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, সমাজের নিম্নতল পর্যন্ত প্রসারিত হয় নাই। ঐ সমস্ত ঘটনার সংঘাতে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর উত্থান-পতন ঘটিয়াছে, সমাজের নিম্নস্তরের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইংরেজদের আক্রমণের ফলে ভারতের সামাজিক কাঠামো এবং ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বনিয়াদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, পুনর্গঠনের লক্ষণ তখনও দৃষ্ট হয় নাই। একদিকে প্রাচীন জগৎ, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত কিন্তু অন্যদিকে তৎপরিবর্তে নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব না ঘটায় হিন্দু সমাজ গভীর অনিশ্চয়তা ও অতলস্পর্শ হতাশায় আচ্ছন্ন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন প্রাচীন ঐতিহ্য

* *Vide* Dr. Tarachand, ***History of the Freedom Movement in India,*** **Vol. I, p. Preface XII**

ও ইতিহাস হইতে ভারতকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে।†

পাশ্চাত্য সংস্পর্শের প্রভাবে ভারতের পুনর্গঠন : কিন্তু এই সর্বব্যাপী ধ্বংসের অন্তরালে লোকচক্ষুর অগোচরে পুনর্গঠনের কাজও শুরু হইয়াছিল, যদিও ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কার্ল মার্ক্স সুদূর ইউরোপে বসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই। ইংরেজগণ শোষণ-ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ভারতবর্ষের বিজিতাংশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে নূতন ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ফলস্বরূপ অল্পদিনের মধ্যে দেশে মধ্যস্বত্বভোগী বিত্তবান এক জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

নব ভারত গঠনের সূত্রপাত

এতদ্ব্যতীত ইংরেজদের অধীনে গোমস্তার কার্য, কেরানীগিরি, বণিক্-বৃত্তি ও দালালের কার্য করিয়া একদল লোক অর্থশালী হইয়া উঠে। ইংরেজদের অনুগৃহীত এই শ্রেণী হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি। এই শ্রেণীই প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং বেসরকারীভাবে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হয়। অবশ্য কোম্পানী শাসনকার্যের সুবিধার জন্য 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' নামে একটি অতি সুদক্ষ শাসনযন্ত্র তৈয়ারী করে এবং উহার সাহায্যে দেশে শৃঙ্খলা এবং ব্রিটিশ আইন-কানুন প্রবর্তন করিয়া প্রজায় প্রজায় আইনগত সমতা স্থাপন করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন : অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার মধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজদের দ্বারাই নবভারত গঠনের ভিত্তি লোকচক্ষুর অগোচরেই ন্যস্ত হয়। ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার ফলেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে এবং বেসরকারী উদ্যোগে ভারতে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। উইলিয়ম কেরী নামে জনৈক পাদ্রী 'দিগ্‌দর্শন' নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া ও বাইবেলের বাংলায় অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘটান। তিনি কয়েকজন মিশনারীর সহযোগিতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য কয়েকটি

† All the civil wars, invasions, revolutions, conquests...... ......in the Hindustan did not go deeper than its surface. England had broken down the entire frame-work of Indian Society without any symptoms of re-constitution yet appearing.—Karl Marx.

বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। কেরী সাহেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পরবর্তী কালে যে-সমস্ত মিশনারী বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেভিড হেয়ার বাংলাদেশে কয়েকটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ডেভিড হেয়ারকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে রামমোহন রায়ও বিশেষ সাহায্য করেন। ডেভিড হেয়ার এবং রামমোহনের সমসাময়িক রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থসাহায্যে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় এবং পববর্তী কালে ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে মেকলে সাহেবের পরামর্শেও রামমোহন রায়-প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষা-অনুরাগীদের সমর্থনে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ইংরেজীকে ভারতের রাজভাষা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতে পশ্চিমী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারের নীতি গ্রহণ করেন। ইহার ফলে দেশে সরকারী ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার আরম্ভ হয় এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অল্পকালের মধ্যে মাদ্রাজ ও বোম্বে শহরেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ভারতের সর্বত্র দ্রুত পাশ্চাত্য শিক্ষা ছড়াইয়া পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজের সংখ্যা ছিল বাইশটি। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ঊনষাটে। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি-সম্বন্ধেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এবং ঐ সমস্ত বিষয় অধ্যয়নের ফলে তাহারা ইউরোপের উন্নত ধরনের চিন্তা, ভাবধারা ও জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হইয়া উঠে। ইহার ফলে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্তদের মনের মুক্তি ঘটে। তাঁহারা অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিবর্তে যুক্তির কষ্টিপাথরে এবং জ্ঞানের আলোয় প্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্য প্রভৃতির বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন এবং ইহার ফলেই বাংলাদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়।

নবজাগরণ

নব জাগরণের প্রবল আলোড়নে পুরাণ-আশ্রিত বহু-ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায় এবং ইহার ফলে ধর্মীয় কু-প্রথা

ও কুসংস্কারগুলির দূরীকরণে সরকারী প্রচেষ্টা যথেষ্ট সফলতা লাভ করে। রামমোহন রায় এক সময়ে এই সংস্কার-আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। জলস্রোত একবার প্রবাহিত হইলে তাহা যেমন একই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না, বহুদূর প্রসারিত হয়, নবজাগরণের প্রবাহও তেমনি ধর্ম হইতে সমাজদেহে সঞ্চারিত হইতে থাকে। রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' ও ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায় যাঁহারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অধিকতর পরিচিত তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, বহুবিবাহ ও পর্দা প্রথার দূরীকরণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নারীজাতির উন্নতি-বিধান প্রভৃতি প্রগতিমূলক সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেন এবং ইহার ফলে ঐ সমস্ত বিষয়ে বহু আইনও সরকারী ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। সমাজের এই প্রগতিমূলক সংস্কারই পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

সামাজিক পরিবর্তন

ইউরোপের নবজাগরণের অন্যতম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল দেশীয় ভাষার উন্নতিতে; ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ প্রতিভাশালী লেখকগণ তাঁহাদের বুদ্ধির দীপ্তিতে ও মনীষায় বাংলাদেশের সাহিত্য, সমাজ সর্বক্ষেত্রে প্রবল কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিলেন এবং এই সকল মনীষীদের অবদানে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে জাতীয় মনোভাব বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

ভাষার শ্রীবৃদ্ধি

জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি : প্রাচীনকালেও ভারতে ধর্ম- ও সংস্কৃতি-ভিত্তিক একটা অস্পষ্ট একাত্মবোধ ছিল, কিন্তু ঐ অস্পষ্ট সংস্কৃতি- ও ধর্ম-ভিত্তিক একতার ধারণাকে আধুনিক অর্থে ন্যাশনালইজম্ বা জাতীয়তাবাদ বলা চলে না। ইংরেজ-সৃষ্ট একই ধরনের শাসন-কাঠামোয় বসবাস করায় ও ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড দেশ এবং এই বিশাল দেশটির একটি বিশিষ্ট আর্থিক বনিয়াদ ও সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তি রহিয়াছে এবং এই ধারণা হইতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গণ-তান্ত্রিক চেতনার বিকাশও ভারতে একই সঙ্গে ঘটে। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টীয় শাসনপদ্ধতি ও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা, ভারতবাসীর হৃদয়ে গণতন্ত্রের

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা

ভাবমূর্তিকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা করে। এই সমস্ত আলোচনার ফলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতেই ভারতে জাতীয়তাবাদেব জন্ম।

সর্বভাবতীয জাতীযতাবাদ

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে-জাতীয় চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে তাহাব পরিমণ্ডল ছিল উদার। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে একই রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করা, আর্থিক দুর্গতি দূব করিয়া দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন করা, বিদেশী শাসনেব ত্রুটি ও উৎপীডন দূব কবিযা আত্মশাসনের অধিকার স্থাপন করা ইত্যাদি ছিল নব-উন্মেষিত জাতীয়তাবাদের লক্ষণ।

জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও প্রচারের প্রভাব: ভারতে নব-উন্মেষিত জাতীয়তাবাদের প্রথম পর্যায়ে ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণেব প্রশ্নটি বড হইয়া দেখা দেয় নাই।

হিন্দু জাতীযতাবাদ ও বঙ্কিমচন্দ্র

কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিব পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদেব মাধ্যমে ধর্ম ও সংস্কৃতিব মাহাত্ম্যকীর্তন ও প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণেরও প্রবল প্রচেষ্টা শুরু হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিব পটভূমিতে যিনি স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি হইলেন স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তেব উইল', 'দেবী চৌধুবাণী', 'বাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস বচনা করিয়া বাংলা ভাষার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা একদিকে যেমন প্রমাণ করেন অন্যদিকে তেমনি ঐ সমস্ত গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা ভাবতবর্ষের হিন্দুদের পূব-গৌরব, বর্তমান শক্তি ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসার কথা ব্যক্ত করেন। আত্ম-বিস্মৃত বাঙালী তথা ভারতবাসীর নিকট তিনি স্বদেশের অতীত গৌরবের বিষয়গুলি তুলিয়া ধরেন। উপন্যাস-ব্যতীত ধর্মতত্ত্ব-সম্পর্কেও তিনি নানা-



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

প্রকার আলোচনা করেন। তৎকালে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ, দয়ানন্দের আর্যসমাজ ও খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুগণ প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা, বহু দেবতার আরাধনা ও হিন্দু সমাজের প্রচলিত এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুমোদিত রীতিনীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঐ বিষয়গুলি-সম্পর্কে আলোচনা করিয়া, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের নব-মূল্যায়ন করেন। ফলে শিক্ষিত হিন্দুদের মনে ভারতের প্রাচীন রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান- ও ঐতিহ্য-সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 'আনন্দমঠ' প্রকাশ করেন। ঐ উপন্যাসটিতে তিনি এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্তা স্বদেশ মাতার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের এক আশাপ্রদ চিত্র তুলিয়া ধরেন। গ্রন্থটিতে যে-জাতীয় পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা পৌরাণিক হিন্দু জাতীয়তাবোধ হইতে প্রসূত। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই বইটির গুরুত্ব অপরিসীম।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও প্রচারের প্রভাব : বঙ্কিমের হিন্দু জাতীয়তাবোধ বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে ও প্রচারণায় সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিকাগোর বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে যোগদান করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করেন। ইহার ফলে হীনম্মন্যতাবোধে ভারাক্রান্ত হিন্দুদের মনে আত্মমর্যাদা ও আত্ম-গৌরব জাগ্রত হয়। বিবেকানন্দের বিরাট সাফল্যে এই প্রথম হিন্দুরা উপলব্ধি করিল যে, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করা অগৌরবের নয় বরং পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই ধারণা ভারতবাসীর মনে সঞ্চারিত হওয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষে স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশ-প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়।



স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের কর্মতৎপরতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল নির্ভীকতার বাণী প্রচার।* তিনি বলিতেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত," "উঠ, জাগো"—জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে ভীরুতা ও দুর্বলতা পরিহার করিয়া বলিষ্ঠভাবে দণ্ডায়মান ও দীর্ঘদিনের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতে আহ্বান জানাইতেন।

নির্ভীকতার বাণী প্রচার

তিনি মনে করিতেন ভীরুতা পাপ, দুর্বলতা কাপুরুষের ধর্ম। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণীতেই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের অধিবাসী সাহস সঞ্চয় করিয়া ব্রিটিশ সিংহের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হয়। ভারতের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিবেকানন্দের অবদান বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত।

অর্থনৈতিক শোষণ: শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়, দেশের আর্থিক দুর্গতিও জাতীয় চেতনার বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। ইংরেজগণ ভারতবর্ষ জয়ের পরে যে-ভূমিব্যবস্থা এখানে প্রবর্তন করেন তাহার ফলে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে স্বল্পসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর কিঞ্চিৎ সুবিধা হইলেও দুঃস্থ কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতে ইংরেজ বিজয়ের সমসাময়িক ঘটনা ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব। শিল্প-বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতের কুটিরশিল্প ধ্বংস হইয়া যায় এবং তন্তুবায়, কর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, চর্মকার, লূনিয়া (লবণ-প্রস্তুতকারক) প্রভৃতি বৃত্তিজীবিগণ বেকার ও নিঃস্ব হইয়া ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। এইভাবে কুটির শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গেল কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদর্শন না করায় ব্রিটিশ বিজয়ের অল্পদিনের মধ্যে ভারতবাসী অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয়। অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ভারতবাসীর নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া সভ্যতাগর্বী ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতবর্ষ হইতে কর বা ট্যাক্সের বোঝা কমাইলেন না এবং তাঁহারা ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য নানাপ্রকার করের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন।

ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় কুটির-শিল্পের ধ্বংস

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু *Discovery of India*-নামক বইটির এক স্থানে লিখিয়াছেন, ব্রিটিশের রাজস্ব ব্যবস্থা এমনি ছিল যে, তাহার ফলে শুধু জীবিত

*Nehru, *Discovery of India*. p. 340.

নয়, মৃত কৃষকের নিকট হইতেও রাজকরের শেষ কড়িটি ইংরেজ শাসকগণ নিংড়াইয়া লইতেন।* দেশের এই আর্থিক দুর্গতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ ভারতীয় অর্থনীতি-বিশারদগণ ভারতের দারিদ্র্য ব্রিটিশ-শাসনে কিরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিভাবে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস হইয়াছে ও ব্রিটিশ ধনিকগণ কি নিদারুণ ভাবে ভারতবাসীকে শোষণ করিতেছে, তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করেন।

শিক্ষিত বেকার

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপন ও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি হয় এবং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে ইংরেজদের অনুগত। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ইংরেজী-জানা মধ্যবিত্তদের সাধারণ ধরনের সরকারী চাকুরী পাইতে অসুবিধা হইত না। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পরে প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যায় কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যুবকগণ বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে থাকেন কিন্তু সরকারী শাসন বিভাগ, রেল ও ডাক বিভাগে তাঁহাদের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সরকারী চাকুরী না পাওয়ায় কেহ কেহ ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, ওকালতি প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হন কিন্তু ঐ সমস্ত বৃত্তি শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকায় অধিকাংশকেই হতাশ হইতে হয়। কেরানী-সৃষ্টিকারী ব্রিটিশ শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনি ছিল যে, চাকুরী না পাইলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের পক্ষে শিল্প-বাণিজ্য গঠন ও পরিচালনারও কোন উপায় ছিল না। এই সমস্ত কারণে প্রতি বৎসর দেশে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার ও অর্ধবেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সমস্ত শিক্ষিত বেকারগণ উপলব্ধি করিলেন যে, দেশের আর্থিক দুর্গতি দূর করিতে হইলে ও দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে হইলে দেশের শাসনযন্ত্রে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ প্রয়োজন। এই সকল শিক্ষিত বেকারদের বিক্ষোভ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।

* ***Discovery of India*, p. 295.**

যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতিতে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধিঃ লর্ড ডালহৌসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ সুদৃঢ় করার অভিপ্রায়ে এবং সৈন্যবাহিনী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে ভারতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপন করেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতার গণ্ডী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, কুসংস্কারের ভিত্তি ভাঙিয়া যায়। রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপন, একটি মাত্র সরকারী ভাষা ইংরেজীর প্রচলন, একই ধরনের মুদ্রা-ব্যবস্থা ও একই ধরনের আইনকানুন ও রীতিনীতি প্রবর্তনের ফলে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল-যে একই ভারতে অবস্থিত, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বাঙালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী-যে একই ভারতের অধিবাসী এই ধারণা সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সর্বভারতীয় ঐক্যবোধই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি এবং ইহা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ বিজয়ের পরোক্ষ ফল।

রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপনে আঞ্চলিকতা ও সঙ্কীর্ণতার ক্রম-অবসান

ভারত-ইতিহাসের পুনরাবিষ্কারঃ দীর্ঘদিন তুর্কী ও মোগল শাসনাধীনে থাকায় ভারতবর্ষ হিন্দু যুগের ইতিহাস ও গৌরবময় কীর্তি-কাহিনী সবই বিস্মৃত হয়। বাংলাদেশ বিজয়ের পরে ইংরেজ তথা ইউরোপীয় পণ্ডিত ও গবেষকগণ বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পর্কে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। ঐ সমস্ত গবেষকগণ সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদগুলি সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে প্রকাশ করেন। ঐ সমস্ত ইউরোপীয় মনীষীদের রচনা পাঠ করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ-সম্পর্কে অবহিত হয়। অন্যদিকে প্রিন্সেপ সাহেব অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের বহু কীর্তি-কাহিনী ভারত-বাসীর নিকট পুনরায় উন্মোচিত করেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্স, উইলকিন্স্, উইলসন্, হুটন্, প্রিন্সেপ, ম্যাক্সমূলার, কানিংহাম, ফার্গুসন, ডঃ হুলজ্ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিত ও গবেষকগণ বিস্মৃতপ্রায় ভারত-ইতিহাস উদ্ধার করায় প্রমাণিত হয় যে, ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশ যখন অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল সেই সময়ে ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গরিমায়, শৌর্যে, বীর্যে ছিল পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় এবং ভারতবর্ষের সুমহান সংস্কৃতি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সীমা-রেখায় আবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষের বাহিরে সুমাত্রা, বলী, বোর্নিও, যবদ্বীপ ও

ইউরোপীয় সংস্কৃতির তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও তজ্জন্য জাতীয় গৌরব বোধ

মধ্য এশিয়ার বহু দেশে এই সংস্কৃতির বিকাশলাভ ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতবাসী একদিকে নবগৌরবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, অন্যদিকে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তির জন্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করে।

মুদ্রাযন্ত্রের ভূমিকা : ভারতের জাতীয় ঐক্য গঠনে ও জাতীয় চেতনা বিকাশে মুদ্রাযন্ত্রের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজ রাজত্বের শুরু হইতে ভারতে ইংরেজীতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ইংরেজী ভাষায় এদেশে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের তীব্র সমালোচনা করায় ওয়ারেন হেস্টিংস ইহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পর ইংরেজী ভাষায় আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বৎসর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন পাদ্রী মার্সম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্সম্যান। আর 'বাংলা গেজেট' প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়। রামমোহন রায়ও কয়েক বৎসর পর 'সংবাদ কৌমুদী' নামে বাংলা ভাষায় এবং 'মিরাৎ উল-আখবার' নামে উর্দু ভাষায় সংবাদপত্র বাহির করেন। কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগে যে-সমস্ত সংবাদপত্র বাহির হইত তাহার অধিকাংশই ছিল সরকার-বিরোধী; ফলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য ইংরেজ সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন এবং জন সিল্ক বার্কিংহামকে প্রেস আইন ভঙ্গের অভিযোগে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। তখন রামমোহন রায় জীবিত। তিনি ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেন এবং এইভাবে ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবে বেন্টিঙ্কের পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন। ইহার ফলে অল্পকালের মধ্যেই দেশীয় ভাষায় নানা ধরনের সংবাদপত্র বাহির হইতে থাকে। এই সকল সংবাদপত্র শুধুমাত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত না—মফঃস্বল শহরগুলি হইতেও মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সংবাদপত্র বাহির হইত। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকা ভারতবর্ষের জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, একদিকে পাশ্চাত্য ভাব

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন

ধারা বিকাশে সংবাদপত্রগুলি যেমন অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, অন্যদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণে সংবাদপত্রগুলি ভীতি বোধ করে নাই; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটাইয়া তাহাদের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টির কার্যে সংবাদপত্রগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তার ও জাতীয়বোধ বিকাশে সংবাদ-পত্রের অবদান

ভারতে সংঘ- বা দল-পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সংবাদপত্রই ছিল রাজনীতি চর্চার একমাত্র বাহন। ঐ সময়ে সংবাদপত্রই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করিত। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অত্যাচারের কাহিনী সংবাদপত্রগুলিই সরকারের গোচরে আনয়ন করিত। ভারতের মুক্তিআন্দোলনে সংবাদপত্রের অবদান অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই।

দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবি : জাতীয় ও গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বৈরাচারী ও আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি করিতে থাকেন। ভারতবাসীর প্রতি সরকারী আমলাদের রূঢ় আচরণ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নবজাগ্রত আত্মমর্যাদায় প্রবল আঘাত করিত। ইহার ফলে দেশের শাসন-ব্যবস্থার উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার যেমন তাঁহারা দাবি করিতে থাকেন অন্যদিকে তেমনি তাঁহারা বড়লাটের শাসন পরিষদ হইতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে অধিকসংখ্যক ভারতীয় সদস্য নিয়োগের দাবিও তোলেন। তাঁহারা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দেশের আর্থিক দুর্গতি ও সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বন্ধ করিতে হইলে দেশে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন আবশ্যক। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতা-সম্পর্কে তৎকালে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না এবং তাঁহারা ইংরেজ শাসনের বিরোধীও ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা মনে করিতেন যে, শাসকের নিকট সুশাসন দাবি করিবার অধিকার প্রজা হিসাবে ভারতীয়দের রহিয়াছে এবং এই দাবি পূরণ করা প্রত্যেক সুসভ্য সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

জমিদার সভা হইতে হোমরুল লীগ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংঘের ইতিহাস

(পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি ধারণার উদ্ভব এবং এই সমস্ত ধারণা ও চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপদান করার আকাঙ্ক্ষা হইতে ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়।)

রামমোহন রায় ছিলেন ভারতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুস্থানীয়। রামমোহনের মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুগামিগণ সভা-সমিতি করিয়া ও সংবাদপত্রে মতামত প্রচার করিয়া ঐ আন্দোলনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন কিন্তু শীঘ্র তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে, সঙ্ঘ গঠন করিয়া আন্দোলন করিলে সুফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অধিক। প্রধানত নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করার সরকারী প্রচেষ্টা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশের মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারগণ কলিকাতায় 'জমিদার সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর-প্রমুখ রামমোহন-পন্থিগণ এই সমিতি-স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। জমির রাজস্ব-সংক্রান্ত বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন করিয়া 'জমিদার সভা' ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে।

জমিদার সভা

'জমিদার সভা'র অন্যতম কর্ণধার দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের 'ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ' আন্দোলনের নেতা টমসনকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। তাঁহার উৎসাহে কলিকাতায় ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গলী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা বঙ্গদেশীয় ব্রিটিশ-ভারতীয় সভা স্থাপিত হয়।* ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের কর্ণধার তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র-প্রমুখ ছিলেন এই সমিতির সভ্য। জমিদার সভা ছিল শুধুমাত্র জমিদারদের প্রতিষ্ঠান। উহাতে মধ্যবিত্তদের সদস্য হওয়ার কোন অধিকার ছিল না। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সকল সদস্যই ছিলেন মধ্যবিত্তসম্প্রদারভুক্ত। এইভাবে একদিকে

টমসনের ভারতে আগমন

বেঙ্গলী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি

*R. C. Majumder—*History of Freedom Movement*, Vol. I, p. 317

জমিদার সম্প্রদায় ও অন্যদিকে মধ্যবিত্তগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে অবতীর্ণ হন।

জমিদার সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—কোনটিই খুব জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে এই দুইটি সঙ্ঘ যুক্ত হওয়ায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। নব-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি ও সম্পাদকের আসনে যথাক্রমে রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃত হন। প্রতিষ্ঠানটির দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম হইতেই ছিল সর্বভারতীয়। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্টে ভারতবাসীকে ভারত-শাসন ব্যাপারে যাহাতে অধিকতর শাসনক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তজ্জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি বিলাতের পার্লামেণ্টে একটি আবেদন-পত্র দাখিল করে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন

ভারতবর্ষের অন্যত্রও এই সময়ে অনুরূপ রাষ্ট্রচেতনার বিকাশ লক্ষিত হয়। বোম্বাইয়ে দাদাভাই নওরোজী, জগন্নাথশঙ্কর শেঠ-প্রমুখ স্বদেশসেবকদের চেষ্টায় এই সময়ে 'বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন' এবং মাদ্রাজে 'দি মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই দুইটি সমিতি কলিকাতার 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'-এর মত ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পূর্বে আবেদন-পত্র প্রেরণ করে।*

বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন ও মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন

সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপে শৈথিল্য প্রকাশ পাইতে থাকে এবং পরবর্তী কালে এই সমিতি বিত্তবান্ জমিদার সম্প্রদায়ের মুখপাত্রে পরিণত হয় এবং সাধারণ ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও তদীয় ভ্রাতাদের নেতৃত্বে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে 'ইণ্ডিয়া লীগ' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়; কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সমিতিটি অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙিয়া যায়। তখন আই. সি. এস. পদ হইতে বিচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাহ্ম সমাজের আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ যুবকদের লইয়া ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ভারত সভা স্থাপন করেন। ভারত সভা-ই ভারতীয় রাজনীতিকে আলোচনার

ইণ্ডিয়া লীগ

ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

* Dr. Tarachand, *History of Freedom Movement*, Vol. II, p. 526.

স্তর হইতে আন্দোলনের স্তরে আনে। (এই সভার নেতারূপে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বয়ঃসীমা হ্রাসের প্রতিবাদে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে পরিভ্রমণ করিয়া জনমত গঠন করেন। দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন, অস্ত্র আইন, ইলবার্ট বিল প্রভৃতির সম্পর্কে ভারত সভা শুধুমাত্র প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের কথা জ্ঞাপন করার জন্য ইংল্যাণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে। ভারত সভাই বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।)

ভারত সভার কার্যকলাপ

এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন, "সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে যে ভারত সভার জন্ম হয় তাহাই সর্বপ্রথম প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মকে একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।"*

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই সময়ে রাষ্ট্রচেতনার বিকাশ যথেষ্ট লক্ষিত হয় তবে তৎকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার পরেই ছিল বোম্বাইয়ের স্থান। বোম্বে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপে শৈথিল্য দেখা দিলে ১৮৭১ খ্রীঃ বোম্বাইয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোশিয়েশনের একটি শাখা স্থাপিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বোম্বাই শাখা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 'ইলবার্ট বিল'-এর প্রতিক্রিয়ায় এই শাখা-সমিতিটি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং, ফিরোজ শাহ্ মেহতা ও বদরুদ্দিন তায়েবজীর নেতৃত্বে বোম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয় এবং জাতীয় কংগ্রেস গঠনে এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত পুনার সার্বজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজন সভার মাধ্যমে ঐ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনার বিকাশ ঘটে। এই সমস্ত সঙ্ঘগুলির [illegible] প্রকাশের সম্মিলিত রূপ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে ভারতে

ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বোম্বে শাখা

পুনায় সার্বজনিক সভা

মাদ্রাজের মহাজন সভা

---

* যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃঃ [illegible]-১১৬।

সঙ্ঘপ্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনের অবসান ঘটে ; তাহার স্থলে দলভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

হোমরুল লীগ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর বহু পরাধীন জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশও ঐ সময়ে স্বায়ত্ত শাসন বা হোমরুল আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল ; কিন্তু নরমপন্থী বা মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী বিরোধে দ্বিধাবিভক্ত দুর্বল কংগ্রেসের পক্ষে ঐরূপ আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ফলে দীর্ঘ ছয় বৎসর কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাজ আদায়ের জন্য চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হোমরুল লীগ স্থাপন করেন এবং ইহার কিছুদিন পরে অ্যানি বেসান্ত অনুরূপ উদ্দেশ্যে আর একটি হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। তিলক ও অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং সারা ভারতে হোমরুল লীগের বহু শাখা স্থাপিত হয়। তিলকের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘগুলি মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তুলনামূলক ভাবে অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগই বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক সময়ে তিলক বলিয়াছেন যে, হাতে-কলমে স্বরাজ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন এবং তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘায়ু কামনা করেন না। স্বায়ত্ত-শাসন মঞ্জুর করার দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি এই সঙ্ঘ বিলুপ্ত করিবেন।*

হোমরুল লীগ

বালগঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেসান্ত

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দান করায়, এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী বা নরমপন্থীদের পুনর্মিলনের ফলে কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যাধিক্য ঘটায় হোমরুল আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে হোমরুল লীগগুলি কংগ্রেসের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

হোমরুল লীগ বিলুপ্তি-কাল

* R. C. Majumder—*History of Freedom Movement*, Vol. II, pp. 372.

সঙ্ঘভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন

নীল বিদ্রোহ : শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ যে-সমস্ত ঘটনায় জাগ্রত হইয়াছিল, নীল বিদ্রোহ তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল রং আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত নীল গাছের পাতা হইতে নীল রং প্রস্তুত হইত এবং ঐ সময়ে নীলের ব্যবসায় ছিল খুবই লাভজনক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অল্প সময়ে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় ইউরোপীয় বাগিচাকরদের (Planters) নীল ব্যবসায়ে উৎসাহিত করে। ফলে বহু দুঃসাহসী ও দুর্বৃত্ত চরিত্রের ইংরেজ তথা অন্যান্য ইউরোপীয় নীলকর বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আসিয়া অনেক নীলকুঠি স্থাপন করে। তৎকালে ঐ সমস্ত কুঠিয়াল সাহেবদের প্ররোচনায় দরিদ্র বাঙালী কৃষকগণ অগ্রিম টাকা বা দাদন লইয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীলের চাষাবাদ করিতে বাধ্য হইত। একবার দাদনের টাকা লইলে দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে নীলকর কুঠিয়ালদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর উপায় থাকিত না। নীলকর সাহেবদের মর্জি-মাফিক কাজকর্ম না করিলে নীলচাষীদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন হইত। নীলকরগণ নীলচাষীদের স্ত্রী-কন্যার শালীনতা ও সম্ভ্রম নাশ করিতে ইতস্তত করিত না। জেলার শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীদের জ্ঞাতসারেই অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত অপরাধের অনুষ্ঠান হইত। দরিদ্র গ্রামবাসী কাহার নিকট বিচার পাইবে তাহা জানিত না। দীর্ঘ দিন এই সমস্ত অত্যাচারের কোন প্রতিকার না হওয়ায় ১৮৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নিরক্ষর নীলচাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নীল চাষ করিতে অস্বীকার করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নীল চাষীরা নীলকুঠিগুলি লুঠপাট করে। নীলকরদের শোষণের বিদ্রোহী হইয়া বিরুদ্ধে নীলচাষীদের এই অসহযোগই নীল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। "নদীয়া, যশোহর ও পাবনা জেলাতেই নীল-বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং যশোহরের চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামক দুইজন গ্রাম্য লোক নীলচাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।"* নীল-বিদ্রোহের ফলে কৃষকদের উপর নীলকরদের আক্রমণ আরও নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

নীলকরদের অত্যাচার

নীল বিদ্রোহ

* যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃঃ ৫৯।

বাংলার চাষীদের উপর অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকরদের অত্যাচারের কথা তাঁহার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরদের বীভৎস অত্যাচারের বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরিলেন। ঐ নাটকের মাইকেল মধুসূদন-কৃত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় লং সাহেবের একমাস হাজত বাস হইল। দরিদ্র নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হইল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার 'নীল কমিশন' নিয়োগ করিলেন। ঐ কমিশনের সুপারিশ-অনুযায়ী নীলকর-অধ্যুষিত জেলাগুলির প্রবীণ ও দক্ষ পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে নীল চুক্তি আইন রহিত করায় নীলকরদের দৌরাত্ম্য অনেকটা দূর হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল প্রস্তুত আরম্ভ হওয়ায় বাংলাদেশে নীলচাষ বন্ধ হইয়া যায়।

মধ্যবিত্তদের সমর্থন

নীল কমিশন



দীনবন্ধু মিত্র

অস্ত্র-আইন ও দেশীয় সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন: ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দলের সমর্থক লর্ড লিটন। ভারতের মত ইংল্যাণ্ডের দেশের শাসক হওয়ার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না, বিজেতৃ-সুলভ ঔদ্ধত্য ও দম্ভ এবং শাসন-ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে তাঁহার শাসনকালে ভারতবাসী ইংরেজদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই সমস্ত কারণে তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা জন্মে যে, ভারতে ব্যাপক বিদ্রোহ আসন্ন। সুতরাং ভারতবাসীকে

লর্ড লিটন

নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে তিনি অস্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন পাশ হওয়ায় ভারতবাসীর পক্ষে বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি আত্ম-রক্ষামূলক অস্ত্র রাখা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু এই আইন ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গীদের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল না। ইউরোপীয় ও ভারতবাসীর মধ্যে এইরূপ বৈষম্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজ সরকারের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে।

অস্ত্র আইন

প্রতিক্রিয়া

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন ঃ ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ায় দেশীয় ভাষায় বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং ঐ সমস্ত সংবাদপত্রের কতকগুলি ছিল সরকারের বলিষ্ঠ সমালোচক। লর্ড লিটনের শাসনকালে অনুষ্ঠিত আফগান যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ দূরীকরণে সরকারের চরম ঔদাসীন্য, দুর্ভিক্ষ তহবিলের টাকা আফগান যুদ্ধের জন্য ব্যয় ইত্যাদি-সম্পর্কে সোমপ্রকাশ, সাধারণী, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় তীব্র সরকার-বিরোধী সমালোচনা হয়। এই সমস্ত সমালোচনা সহ্য করার মত মানসিক ঔদার্য রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদী লর্ড লিটনের ছিল না। সুতরাং তিনি ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'কাউন্সিলে' একদিনের অধিবেশনে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' বা 'দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র আইন' পাশ করাইয়া লন। এই আইনের ফলে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে সরকার-বিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর মুদ্রাযন্ত্রের গচ্ছিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

কারণ

আইনের প্রধান ধারা

এই আইন পাশ করার প্রতিবাদে সোমপ্রকাশ, সাধারণী প্রভৃতি কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ পত্রিকার কাজ বন্ধ করিয়া দেন এবং শিশিরকুমার ঘোষ 'অমৃতবাজার' পত্রিকাকে রাতারাতি ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। দেশীয় সংবাদ-পত্রগুলির বিরুদ্ধে এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে 'জাতিবৈর' অর্থাৎ ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত শত্রুতা আরও বাড়িয়া যায়।

ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া

ইলবার্ট-বিল বিতর্ক ও সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ঃ রক্ষণশীল লর্ড

লিটনের পরে ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন উদারনীতিবাদী লর্ড রিপন। যুদ্ধজয়ের গৌরব অপেক্ষা শাসনসংস্কারের মাধ্যমে প্রজা-কল্যাণই ছিল তাঁহার কাম্য। তিনি লর্ড লিটনের কুখ্যাত দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন।

লর্ড রিপন

'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-আইন' রিপনের শাসনকালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই আইন পাশ করিয়া তিনি লোকাল বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাপন করেন এবং সাধারণ ভোটে এই সমস্ত সংস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই আইনে প্রত্যেক বোর্ডে এক-তৃতীয়াংশ সরকার-মনোনীত সদস্যও থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিতেও তিনি নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করেন। স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যভার এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'প্রজাস্বত্ব আইন' বিধিবদ্ধ করিয়া জমিদারদের অত্যাচারের হাত হইতে প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শাসনকালে দশ বৎসর অন্তর লোকগণনা বা আদমসুমারীর সূত্রপাত হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণের জন্য ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট পাশ করা হয়। হান্টার কমিশন নিয়োগ করিয়া তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান করেন।*

রিপনের বিবিধ সংস্কার

কিন্তু ভারতবাসীর নিকট লর্ড রিপনের শাসনকাল অন্য একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয়—তাহা হইল ইলবার্ট বিল-সম্পর্কিত আন্দোলন। তৎকালে ভারত সরকারের বিচার বিভাগে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসৃত হইত। শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচারের অধিকার ভারতীয় বিচারকগণের ছিল না। তাই, (আইনের চক্ষে দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ বিচারকদের মধ্যে সমতা স্থাপনের জন্য লর্ড রিপন আইন-সচিব ইলবার্টকে একটি খসড়া-আইন প্রস্তুত করিতে বলেন। ইলবার্ট সাহেবের নামানুসারে আইনের খসড়াটি 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত হয়।) ঐ বিলে ভারতীয় বিচারকদিগকে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরাধীন ভারতবর্ষের 'নেটিভ' বিচারকগণ বিজেতা শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের

ইলবার্ট বিল

* নবম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে লর্ড রিপনের শাসন সংস্কার আলোচনা করা হয় নাই। তজ্জন্য ইলবার্ট বিল বিতর্ক প্রসঙ্গে রিপনের শাসন সংস্কার সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

বিচার করিবে—এই অপমানে ভারতের ইংরেজ ও তাহাদের অনুচর ফিরিঙ্গীরা এক তুমুল আন্দোলন শুরু করে এবং তাহারা একটা ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশনও গঠন করে। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীরা বিলটি বর্জনের জন্য যেমন আন্দোলন করে, তেমনি বিলটি পাশ করাইবার জন্য বাংলাদেশ ও বোম্বাইয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আন্দোলন করেন। কিন্তু ইউরোপীয় সম্প্রদায়-কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের তীব্রতায় বিচলিত হইয়া লর্ড রিপন ইলবার্ট বিলের বিভিন্ন ধারা সংশোধন করেন। শেষ পর্যন্ত সংশোধনের ফলে স্থির হয় যে, শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় বিচারক-গণের মধ্যে বিচারের অধিকারগত কোন পার্থক্য থাকিবে না; কিন্তু কোন শ্বেতাঙ্গ অপরাধী আদালতে হাজির হইলে সে জুরীর বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবে এবং ঐ জুরীর অধিকাংশ হইবে শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায়ভুক্ত। সংশোধিত আকারে বিলটি পাশ হওয়ায় বিলটির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

সম্প্রদায়ের আন্দোলন

বিলের সংশোধন

ইলবার্ট বিল-বিরোধী আন্দোলন ভারতবাসীর আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যেমন ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত শত্রুতা বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইলবার্ট বিলকে উপলক্ষ করিয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের শিক্ষা ভারতবাসী কোনদিন ভুলে নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠ ইউরোপীয় সম্প্রদায় শুধুমাত্র সঙ্ঘশক্তির গুণে কিভাবে অসাধ্যসাধন করিল তাহা দেখিয়া ভারতবাসীও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রসর হইল।

ইলবার্ট আন্দোলনের ফলাফল

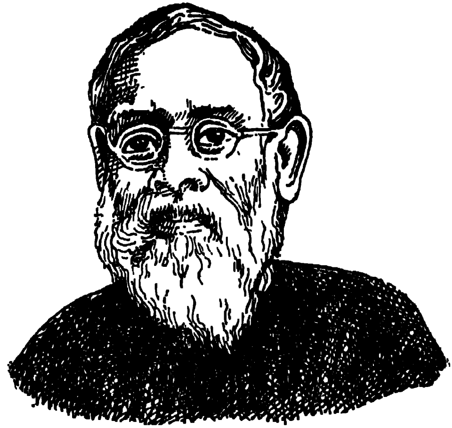
সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব : ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময়ে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন হাই কোর্টের বিচারপতি নরিস সাহেব, অন্যদিকে লালমোহন ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেন।

এই কারণেই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ও শ্বেতাঙ্গ আন্দোলনের নায়ক—কলিকাতা হাই কোর্টের বিচারকগণ তাঁহার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। হাই কোর্টের বিচারপতি নরিস সাহেব একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে আদালতে হিন্দুদের শালগ্রাম শিলা বিগ্রহ আনয়ন করিয়া তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করিলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বিচারপতি নরিস সাহেবের

তীব্র সমালোচনা করেন। ইহার ফলে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁহার দুই মাসের জেল হয়। ব্রিটিশ শাসনে দেশপ্রেমের জন্য এইরূপ কারাভোগ বোধ হয় এই প্রথম। দেশসেবার জন্য কারাবরণ করায় তিনি নব-জাগ্রত বাঙালী তথা ভারতবাসীর নেতারূপে শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁহার কারাদণ্ডের প্রতিবাদে কলিকাতার দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, ব্যবসায়-বাণিজ্য স্তব্ধ হয়, ছাত্ররা ধর্মঘট করে।

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড

সমগ্র বাংলাদেশে তাঁহার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বহু জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন বা 'ভারত সভা'র উদ্যোগে বিডন স্কোয়ারে যে-জনসভা হইয়াছিল, তাহাতে ২০ হাজার লোকের সমাগম হয়। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বাংলাদেশেই শুধু আন্দোলন হয় নাই, আগ্রা, ফৈজাবাদ, অমৃতসর, লাহোর, পুনা প্রভৃতি স্থানেও প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে এই প্রথম প্রমাণিত হয় যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী পরস্পরের জন্য বেদনা বোধ করিতে শিখিয়াছে এবং সমগ্র ভারত একই সূত্রে গ্রথিত। প্রকৃতপক্ষে ইলবার্ট আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অন্যায় দণ্ডাদেশ ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ় করিয়া তোলে।



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কারাদণ্ডের প্রতিক্রিয়া

জাতীয় সম্মেলন, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ ঃ সুরেন্দ্রনাথ জেল হইতে মুক্তি পাইয়া বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ভারত সভার আনুকূল্যে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় ডিসেম্বর মাসে একটি জাতীয় সম্মেলন বা **National Conference** আহ্বান করেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী নেতৃবর্গের অনেকেই রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ জাতীয় সম্মেলনে

যোগদান করেন। সম্মেলনে প্রায় একশত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন; তিন দিন ধরিয়া অধিবেশন চলে। আনন্দমোহন বসু তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, ভাবী ন্যাশনাল পার্লামেন্ট বা জাতীয় পরিষদের প্রথম স্তর হইল ন্যাশনাল কনফারেন্স। এই সম্মেলনে সর্বভারতীয় কতকগুলি দাবি প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক সম্মেলনগুলিতে বহু বৎসর ধরিয়া ঐ ধরনের প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে। প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা পরিষদ গঠন, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থা, শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথক্‌করণ, সিভিল সার্ভিসে ও অন্যান্য উচ্চ রাজপদে অধিক-সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ, জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন, অস্ত্র আইন রহিতকরণ ভারতবাসীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই সব বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সম্মেলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সর্বভারতীয়। জাতীয় সম্মেলনকে তাই নির্দ্বিধায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যায়।



আনন্দমোহন বসু

প্রশ্নাবলী

১। ভারতের স্বাধীনতা বা মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত কখন হয়?

২। পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতবর্ষে কি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়?

৩। ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলাফল আলোচনা কর।

৪। জাতীয়তাবাদের লক্ষণ কি? ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব ছিল কি?

৫। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের পার্থক্য নিরূপণ কর।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতে যে-জাতীয় মনোভাব উন্মেষে সহায়তা করেন তাহার বৈশিষ্ট্য কি?

৭। ভারতের জাতীয়তাবোধ বিকাশে বিবেকানন্দের অবদান নির্ণয় কর।

৮। অর্থনৈতিক শোষণ ও বেকার সমস্যা কিভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকাশের সহায়ক হইয়াছিল?

৯। ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক কি?

১০। "পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

১১। 'ভারত সভা' বা ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১২। 'জমিদার সভা' হইতে 'ভারত সভা' পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকাশে কতটা সহায়ক হইয়াছে?

১৩। 'সজ্ঘ প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলন' ও 'দলভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন' কথা দুইটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১৪। নীল বিদ্রোহ কি? নীলকরদের অত্যাচার কিভাবে দূরীভূত হয়?

১৫। লিটনের শাসনকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়াছিল কেন?

১৬। ইলবার্ট বিল কি? জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বিলটির সম্বন্ধ নিরূপণ কর।

১৭। ইলবার্ট বিল বিতর্কে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের ফলাফল কি হইয়াছিল?

১৮। জাতীয় সম্মেলন কি? এই সম্মেলনে কি কি প্রস্তাব গৃহীত হয়? জাতীয় সম্মেলনকে কি কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যায়?

১৯। রিপনের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২০। টীকা লিখ:

(ক) জমিদার সভা, (খ) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, (গ) অস্ত্র আইন, (ঘ) নীল বিদ্রোহ, (ঙ) বেঙ্গলী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ও আদি পর্বের ইতিহাস

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা: ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, পুনার সার্বজনিক সভা, মাদ্রাজের মহাজন সভা প্রভৃতি সংঘের কর্ম-তৎপরতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড ভাবে যে-জাতীয় ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে সাংগঠনিকভাবে তাহাই সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। জন্মমুহূর্ত হইতে কংগ্রেস ভারতের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া বলেন যে, কংগ্রেসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস।[১]

বাংলা ভাষায় 'কংগ্রেস' শব্দের অর্থ 'মহাসভা'। ভারতবর্ষে এইরূপ একটি সর্বভারতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রথমে কাহার মনে উদিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা খুবই কঠিন। অ্যানি বেসান্ত বলিয়াছেন যে, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে থিওসফিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনের পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ১৭ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি মাদ্রাজে জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে বসিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া বলেন যে, কংগ্রেসের মত একটি সর্বভারতীয় মহাসভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অনেক ভারতীয় নেতা-ই অনুভব করিয়াছিলেন। অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম উদ্যোগী হইয়া এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা



অ্যানি বেসান্ত

১. *Vide* : *The History of Congress.* Vol. I. Pattabhi Sitarammayya, p. 1.

করেন।[২] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দিল্লীর দরবারের আদর্শে সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে জাগ্রত হয়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আনুকূল্যে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম 'জাতীয় সম্মেলন' আহ্বান করেন। জাতীয় সম্মেলনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আই. সি. এস. অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেস স্থাপন করেন।[৩] সুতরাং কংগ্রেস সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতীয় সম্মেলন'-এর অনুকরণেই সৃষ্ট। কোন কোন লেখকের মতে 'কংগ্রেস' শব্দটিও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।[৪]

জাতীয় কংগ্রেসের জনক অক্টোভিয়ান হিউম

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে প্রথম জাগ্রত হইলেও অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম-ই ছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিউম সাহেব ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘব ও ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করার জন্যই তিনি জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে তাঁহার জীবনীকার ও বিংশতিতম কংগ্রেসের সভাপতি ওয়েডারবার্নের মতামত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের সচিব পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম সিমলায় বসিয়া শত শত গোয়েন্দা রিপোর্ট পাঠ করেন এবং ইহার ফলে তাঁহার ধারণা হয় যে, ভারতবর্ষে একটি ভয়ঙ্কর বিপ্লব আসন্ন। ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আসন্ন বিপ্লব হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় শিক্ষিত জনসেবী বা দেশসেবকের সহযোগিতায় ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' নামে একটি 'নিরাপদ প্রতিষ্ঠান' গঠন করেন। পরে তিনি

২. *Vide* : *The History of Congress*. Vol. I. Pattabhi Sitarammayya, p. 11.

৩. *Vide.*: *History of the Freedom Movement in India.* Vol. I. R. C. Mazumder, p. 388-389.

৪. *Vide.*: *Congress & Congress-men iu Pre-Gandhian era.* B. B. Mazumder & B. P. Mazumder, p. 2.

তাঁহার কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে বিশেষত ভারতের বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫-এ ডিসেম্বর তারিখে পুনা শহরে 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন'-এর একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। পুণায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় হিউম সাহেব বোম্বাই শহরে স্থান পরিবর্তন করেন এবং ঐ সময়ে ন্যাশনাল ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করিয়া 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' বা 'জাতীয় কংগ্রেস' নামকরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন গঠন ও কংগ্রেসের জন্ম

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ৭২ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এবং কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে বাংলা তথা ভারতের সুপরিচিত বরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলন ও কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শ ও নীতিগত সাদৃশ্য থাকায় 'জাতীয় সম্মেলন'কে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের মধ্যে বিলুপ্ত করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর মত বরেণ্য নেতৃবৃন্দের যোগদানে দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় হইতে কংগ্রেস বিশেষভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রথম অধিবেশনে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দেন। সভায় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ঐ সকল প্রস্তাবের মধ্যে ব্যবস্থা পরিষদের সংস্কার-সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রস্তাবটির উত্থাপক ও সমর্থক ছিলেন যথাক্রমে কাশীনাথ এ্যম্বক তেলাং ও এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার। প্রস্তাবটিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচন, সরকারী আয়ব্যয়-নির্ধারণে ও আইন-প্রণয়নে নির্বাচিত সদস্যদের অধিকার দাবি করা হয়।



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ও গৃহীত প্রস্তাব

সেই সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যায় এবং পাঞ্জাবে শাসন-পরিষদ ও পার্লামেন্টে একটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। সর্বশেষে হিউম সাহেব মহারানী ভিক্টোরিয়ার জয়ধ্বনি করিয়া সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উৎস-মুখে শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় অনাড়ম্বরভাবে ও ক্ষুদ্রাকৃতিতে এইভাবেই পরবর্তী কালের বিশাল প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের জন্ম।

১৮৮৫–১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পরিচয় ও কার্যাবলী ঃ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের পরে ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে বড়দিনের বন্ধের সময় প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে থাকে এবং ঐ সমস্ত অধিবেশনে প্রতিনিধিদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, বাংলাদেশ হইতে জনকয়েক ভূম্যধিকারী ও বোম্বাই হইতে কতিপয় ব্যবসায়ীকে প্রতিনিধি দলে দেখা যাইত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে স্যার সৈয়দ আহম্মদ কংগ্রেসের বিরোধিতায় লিপ্ত হন। তাহার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের একটি বড় অংশ কংগ্রেস-পরিচালিত রাজনীতি হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখেন। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্যার সৈয়দ আহম্মদের বিরোধিতা-সত্ত্বেও কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে মুসলিম সদস্য বদরুদ্দিন তায়েবজী সভাপতিত্ব করেন।



বদরুদ্দিন তায়েবজী

আদি পর্বে গাম্ভীর্যপূর্ণ ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত। সভার প্রারম্ভে রাজভক্তিমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইত, যুক্তিসহকারে আবেদন ও প্রার্থনার আকারে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভারতবাসীর দাবি উত্থাপন করিতেন। বক্তাগণও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিতেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তিন বৎসর পর্যন্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

আদি পর্বে কংগ্রেস অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনের সময় হইতে তাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধিতায় লিপ্ত হন। কংগ্রেস ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট যে-সমস্ত আবেদন-নিবেদন করিতেন, ভারতস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণ সেই প্রতিবেদনে বিশেষ কর্ণপাত করিতেন না। তখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সুবিচারের আশায় ইংল্যাণ্ডে জনমত গঠনে উদ্যোগী হন এবং ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারা দাদাভাই নওরোজী, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন ও আরও কয়েকজন ইংরেজের পরিচালনাধীনে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি" নামে লণ্ডনে জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা স্থাপন করেন। এই কমিটি ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে 'ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারত সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবে অসন্তুষ্ট কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভারতবাসীর বিভিন্ন প্রকার দাবি আদায় ও অভিযোগের প্রতিকারের জন্য যুগপৎ ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে-চাপ সৃষ্টিকারী আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহাই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা Constitutional Agitation নামে পরিচিত। এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলেই ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। ইহার ফলে সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পায়, এবং সদস্যগণ বাজেট আলোচনা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার লাভ করেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সরকারী দানের কৃপণতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটির মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে জনমত গঠন


স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন

ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট

এতদ্‌সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের সদাশয়তায় আস্থাশীল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রথম অধিবেশনে যে-সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্তী বহু বৎসর ধরিয়া তাহারই প্রায় পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ভারতবাসীর নিদারুণ দারিদ্র্য, আর্থিক দুর্গতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, লবণ ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কিত নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথম অধিবেশন হইতে পরবর্তী কুড়ি

কংগ্রেসের আদি পর্বে গৃহীত প্রস্তাবাদির বিবরণ

বৎসর ধরিয়া (১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে জনপ্রতিনিধিত্বের প্রবর্তন করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, (২) ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বিলোপ-সাধন, (৩) সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস, ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা-গ্রহণের অধিকার, (৪) আইন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথককরণ, (৫) উচ্চপদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ এবং বিলাতে ও ভারতে যুগপৎ আই. সি. এস. পরীক্ষাগ্রহণের দাবি জানাইয়া কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলিতে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে প্রতিফলিত হইয়াছে।



আর. সি. দত্ত

আদিপর্বের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নাম

১৮৮৫-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যাঁহারা কংগ্রেস পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেহ্‌তা, পি. আনন্দ চার্লু, ডি. ই. ওয়াচা, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, সি. শঙ্করণ নায়ার ও বালগঙ্গাধর তিলক। বদরুদ্দিন তায়েবজী, রহমতুল্লা সিয়ানী, জর্জ ইউল, আলফ্রেড্



পি. আনন্দ চার্লু



লালমোহন ঘোষ

ওয়েব, স্যার উইলিয়ম্ ওয়েডারবার্ন, স্যার হেনরী কটন, আনন্দমোহন বসু,



জর্জ ইউল



আলফ্রেড ওয়েব



সি. শঙ্করণ নায়ার



আর. এন. মুধোলকার



নবাব সৈয়দ মহম্মদ



স্যার হেনরী কটন



এন. জি. চন্দ্রভারকার



ডি. ই. ওয়াচা



পি. এস. মেহতা



রহমতুল্লা সায়ানী



মদনমোহন মালব্য



ভূপেন্দ্রনাথ বসু

লালমোহন ঘোষ ও রমেশচন্দ্র দত্তের মত মনীষিগণ কংগ্রেসের কোন কোন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিলেও কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোন দিনই তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।

পরিবর্তনশীল ভূমিকা: রাজভক্ত-বিরোধীর ভূমিকা পালনে কংগ্রেসের অক্ষমতা: কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তিন বৎসর পর্যন্ত ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের পরে বড়লাট লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিনিধিদের চা-পানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। নবসৃষ্ট কংগ্রেসকে বড়লাট ডাফরিন ভারত সরকারের আইনানুগ বিরোধী দল রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জন্মলগ্ন হইতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যে-ভাষায় ও যে-ভাবে সরকারী ভুলত্রুটির সমালোচনা করেন, তাহাতে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী-বৃন্দ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। অন্যদিকে দেশের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস-অধিবেশনে যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহা অবহেলা করায় কংগ্রেসের জনক হিউম সাহেব ভারতে গণ-আন্দোলন সৃষ্টির হুমকী প্রদর্শন করেন। ইহার ফলে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদ কংগ্রেসের প্রাক্কালে সরকারী কর্মচারীরা নব-প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির বিরোধিতায় লিপ্ত হন। এই সময় হইতে স্যার সৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে থাকেন।

ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের কংগ্রেস-বিরোধিতা

বড়লাট লর্ড ডাফরিন ঐ সময়ে কংগ্রেস সম্পর্কে অবজ্ঞাভরে মন্তব্য করেন যে, কংগ্রেস অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দর্শনযোগ্য অতি ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং ভারতের অগণিত জনতার মুখপাত্ররূপে কথা বলার অধিকার কংগ্রেসের নাই।

ডাফরিনের অবজ্ঞা-পূর্ণ মন্তব্য

আবেদন-নিবেদনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ: কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ জাতির উদারতায় ও সদাশয়তায় এত বেশি আস্থাশীল ছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডে ভারতের দাবি জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে দ্বিধা করেন নাই, এবং ভারত ও ইংল্যাণ্ডের শাসকদের নিকট বৎসরের পর বৎসর একই ধরনের দাবি উত্থাপন করিতেও ক্লান্তিবোধ করেন নাই। কিন্তু বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কংগ্রেসের ঐ সকল প্রার্থনায়

আবেদন-নিবেদন নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা

কর্ণপাত করেন নাই। কংগ্রেসের প্রতি বৎসরের পর বৎসর এইরূপ অবহেলা প্রদর্শন করায় কংগ্রেসের অনুসৃত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা আবেদন-নিবেদনমূলক নীতির প্রতি অনেকেই ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় কংগ্রেস-অনুসৃত-কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেন। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসের অনুসৃত আবেদন-নিবেদনমূলক নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। নাটোরের জমিদার জগদিন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেস-অনুসৃত আন্দোলনের পদ্ধতিকে 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' বলিয়া সর্বপ্রথম অভিহিত করেন।* এইভাবে জন্মের কুড়ি বৎসরের মধ্যেই প্রবীণ নেতৃবৃন্দের অতি সাবধানী ও রাজানুগত্যমূলক মনোভাব ও নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যেই প্রবল অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে বিভক্ত করায় পুঞ্জীভূত এই অসন্তোষই চরমপন্থী আন্দোলনে তীব্রভাবে বিস্ফোরিত হয়।

অরবিন্দ ঘোষ, তিলক ও জগদিন্দ্র রায়-কর্তৃক কংগ্রেস নীতির কঠোর সমালোচনা

অনুশীলনী

১। কংগ্রেস স্থাপনের পরিকল্পনা প্রথম কাহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল?

২। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতাদের নাম লিখ ও তাহাদের কর্মতৎপরতা-সম্পর্কে যাহা জান লিপিবদ্ধ কর।

৪। প্রথম কুড়ি বৎসরে কংগ্রেসের অধিবেশনে কি কি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে?

৫। টীকা লিখ :

(ক) জাতীয় ইউনিয়ন (ন্যাশনাল ইউনিয়ন), (খ) জাতীয় সম্মেলন (ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স), (গ) নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন (কন্‌স্টিটিউশনাল এ্যাজিটেশন), (ঘ) ভিক্ষানীতি।

---

* *Vide Congress & Congress in the Pre-Gandhian era.* p, 60.
B. B. Majumder & B. P. Majumder.

তৃতীয় অধ্যায়
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ—জাতীয়তাবাদের প্রতি ব্রিটিশ চ্যালেঞ্জ: উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলাদেশের আয়তন ছিল বিপুল। (একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসনাধীন এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ এবং ইহার আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯ শত বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ।)



বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ঘোষণা করিলেন যে, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া প্রদেশটিকে দ্বিধাবিভক্ত করিবেন। শুধুমাত্র শাসনকার্যের সুবিধার জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করিয়াছিলেন মনে করিলে ভুল হইবে। তৎকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল বাংলাদেশ। লর্ড কার্জন স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে,

বঙ্গভঙ্গের শাসনতান্ত্রিক কারণ

বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইলে পুনর্গঠিত পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় সংখ্যালঘু হইবে এবং বিহারী ও ওড়িয়াদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীরা হীনবল হইয়া পড়িবে। দুইটি প্রদেশে বিভক্ত হইলে একদিকে যেমন বাঙালীরা শক্তিহীন হইবে অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসামে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা যাইবে। উদীয়মান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতের উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গভঙ্গ করেন।

বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণ

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রথম প্রকাশ করায় সমগ্র দেশ প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠে। লর্ড কার্জনও অতঃপর দুই বৎসর এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন এবং ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সকলের অজ্ঞাতে ও অতি গোপনতার সঙ্গে বঙ্গবিচ্ছেদের ব্যবস্থা পাকা করিয়া ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণায় তিনি বলেন যে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশ দুইটি প্রদেশে বিভক্ত হইবে। একটি প্রদেশের নাম হইবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে পূর্ববঙ্গের রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগসহ সমস্ত আসাম প্রদেশ। বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলার প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ লইয়া গঠিত অন্য প্রদেশটির নাম হইবে বাংলাদেশ।

বিভক্ত বঙ্গের সীমারেখা

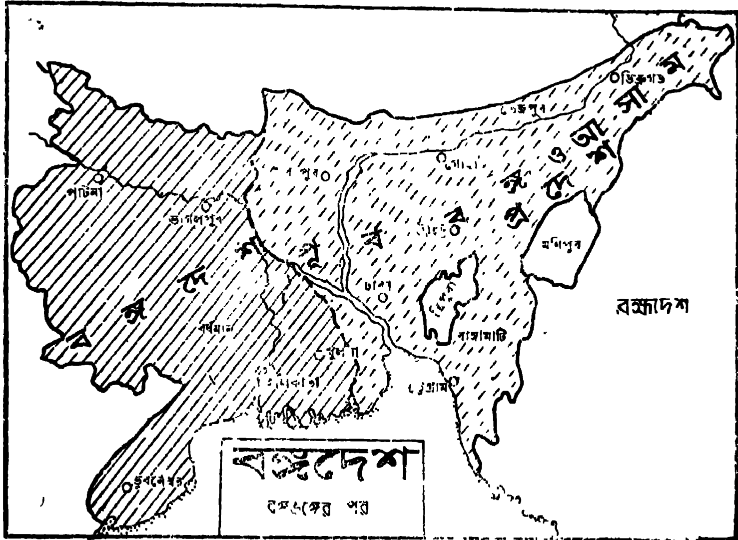
কার্জন-কর্তৃক বঙ্গবিভাগের এই সিদ্ধান্তকে বাঙালীরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি ইংরেজদের চ্যালেঞ্জ বা যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলিয়াই গ্রহণ করিল। তাই এই সিদ্ধান্তকে বাতিল করার জন্য তাহারা প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু করে এবং প্রতিবাদের রূপও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বসুমতী, অমৃতবাজার, চারুমিহির, বেঙ্গলী, ঢাকা প্রকাশ প্রভৃতি বাঙালী সংবাদপত্র এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দায় মুখর হইয়া উঠে, বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে বহু প্রতিবাদ সভা আহূত হয় ও বহু শোভাযাত্রা বাহির হয়।

বাংলার পত্রিকায় প্রতিবাদ

কার্জনের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য বিভিন্ন জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ভারত সরকার ও ইংল্যাণ্ডের সরকারের নিকট প্রতিবেদন ও স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। এই সকল আবেদন পত্রের মধ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে সত্তর হাজার লোকের স্বাক্ষর-

ইংল্যাণ্ডে স্মারকলিপি পেশ

বিশিষ্ট ইংল্যাণ্ডে ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবেদন-নিবেদন ব্যতিরেকে কেহ কেহ বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান। সঞ্জীবনী



পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ইংরেজদের জব্দ করিবার জন্য বিলাতী পণ্য বয়কট বা বর্জন ও দেশজাত পণ্যক্রয়ের প্রস্তাব করেন। সঞ্জীবনী সম্পাদকের এই প্রস্তাব প্রথমে খুলনা জেলার বাগের-হাটের একটি জনসভায় সমর্থিত হয়, পরে মফঃস্বলের আরও কয়েকটি জনসভায় গৃহীত হয়। কলিকাতায় টাউন হলে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ৭ই আগস্টে অনুষ্ঠিত সভায় বয়কট বা বিলাতী পণ্য বর্জন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচীরূপে গৃহীত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ঐ সভায় এত জনসমাগম হয় যে, পাশাপাশি আরও দুইটি সভা করিয়া শ্রোতৃবর্গের দাবি পূরণ করিতে হয়।

সঞ্জীবনী পত্রিকায় বয়কট প্রস্তাব

স্বদেশী আন্দোলন

টাউন হলের সভার পরে বাংলাদেশে শত শত সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করা হয়। পরিসংখ্যানে প্রকাশ ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলাদেশে ২০০০ জনসভা হয়। কিন্তু এই সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্বৈরাচারী ব্রিটিশ সরকার

পূর্ব-নির্দিষ্ট তারিখে বঙ্গভঙ্গ করেন। বঙ্গভঙ্গের দিনে (১৬ই অক্টোবর) বাঙালীরা শোকদিবস পালন করে। দেশের সর্বত্র হরতাল, রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালিত হয়। ঐদিন বৈকালে কলিকাতায় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আনন্দ-মোহন বসুর সভাপতিত্বে দুই বাংলার ঐক্যের প্রতীক স্বরূপ মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ন্যাশনাল ফাণ্ড বা জাতীয় ধনভাণ্ডারও খোলা হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে বাঙালীর ব্রিটিশদের সম্পর্কে যে-মোহ ছিল তাহা ভাঙিয়া যায়। বাঙালীরা আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

বঙ্গভঙ্গের দিন দেশব্যাপী হরতাল ও অরন্ধন পালন

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনঃ বঙ্গভঙ্গ প্রতিকারের আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বিলাতী পণ্য বর্জন করিয়া ইংরেজদের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি সাধন করা; ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইবেন এইরূপ মনোভাব হইতেই বিলাতী বর্জন বা বয়কট আন্দোলনের সূত্রপাত। এই ঘটনার অল্পকাল পূর্বে চীনদেশে যে-বয়কট আন্দোলন হইয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশের নেতৃবৃন্দ বোধ হয় জানিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের মূল রূপ ছিল বয়কট বা বিলাতী পণ্য বর্জন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যরূপ ছিল স্বদেশী। স্বদেশী গ্রহণ বা স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার, দেশীয় শিল্পকে সমর্থন, স্বদেশী ভাবধারার অনুশীলন ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গঠনমূলক কর্মসূচী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ এবং পরবর্তী কালেও ভারতের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার, স্বদেশী শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বয়কট ও স্বদেশী শব্দ দুইটি বাংলাদেশে নূতন তাৎপর্যে পরিমণ্ডিত হয়। বয়কট আন্দোলন বিলাতী পণ্য বিশেষত বিলাতী বস্ত্র বর্জনের রূপ নেয়। অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলন প্রথমে স্বদেশী শিল্পের বিকাশ, আত্মনির্ভর-শীলতা, স্বাবলম্বন ও পরে স্বরাজের বাণী লইয়া বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হয়।

'বয়কট' ও 'স্বদেশী'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা

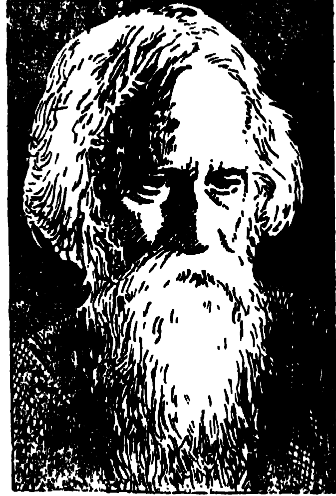
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অম্বিকাচরণ

মজুমদার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল-প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সমর্থনে ও বাগ্মিতায় বাংলা শহর ও পল্লীতে অপূর্ব শক্তিতে আত্ম-প্রকাশ করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস-প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরাও এই আন্দোলনকে বাংলাদেশের

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ



অম্বিকাচরণ মজুমদার



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সর্বত্র জনপ্রিয় করিয়া তোলেন।

দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমর্থনপুষ্ট হইয়া ছাত্র ও যুবকগণ দলে দলে এই আন্দোলনে যোগদান করে। স্বদেশী আন্দোলন ও বিলাতী বর্জনকে সফল করার জন্য দেশে নানাপ্রকার সঙ্ঘ সমিতিও স্থাপিত হয়। ছাত্র ও যুবকগণ বিলাতী পণ্য বর্জনের জন্য পিকেটিং আরম্ভ করে, স্থানে স্থানে বিলাতী পণ্যদ্রব্য বিশেষত বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করে। বয়কট আন্দোলনের ফলে বিত্তবান বাঙালীরা নূতন শিল্প বা কলকারখানা স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। আমেদাবাদের দেশী কাপড়ের মিল-গুলির ঐশ্বর্য-বৃদ্ধি ঘটে এবং ভারতে বিলাতী পণ্যের বিশেষত বস্ত্রের ব্যবসায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই আন্দোলনের ফলে ভারতে দেশীয় শিল্প-বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

ছাত্র ও যুবকদের আন্দোলনে যোগদান ও বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব

প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলন দমনের জন্য সরকার পক্ষ হইতে কঠোর নীতি অবলম্বিত হয় নাই, কিন্তু বিলাতী বর্জন আন্দোলন সফল হওয়ায় সরকারী দমননীতি ও আক্রমণ ক্রমশ হিংস্র হইয়া উঠে। বঙ্গভঙ্গের শুরুতে সরকার রিজ্‌লি, কার্লাইল, লায়নস্ প্রভৃতি সার্কুলার জারি করিয়া ছাত্রদের আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সমস্ত সার্কুলারে ভীত না হওয়ায় সরকার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অপরাধে ছাত্রদের স্কুল কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করেন। কোন কোন স্থানে ছাত্রদের বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে প্রকাশ্যে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ হয়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশাল শহরে আহূত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন পূর্ববঙ্গ সরকার ভাঙিয়া দেন। সম্মেলনের পূর্বে পুলিশ-প্রহারে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আহত হন। সর্বজন-শ্রদ্ধের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার পরে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে পিটুনী পুলিশ ও গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হয়।

আন্দোলন-দমনে সরকারের হিংস্রতা বৃদ্ধি

বন্দেমাতরম ধ্বনি নিষিদ্ধ ও পুলিশ-কর্তৃক প্রাদেশিক সম্মেলন ভঙ্গ

বরিশালের ঘটনার পরে বাংলাদেশ তথা ভারতে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলন নূতন পথে অগ্রসর হয় এবং নব উন্মেষিত জঙ্গী জাতীয়তাবাদ দ্রুতগতিতে ভারতের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। আবেদন-নিবেদন নীতির সমর্থক মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ এই সময় হইতে জনপ্রিয়তা হারাইতে থাকেন। (অন্যদিকে বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ-প্রমুখ জাতীয়তাবাদী বা চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ অতি দ্রুত বাংলাদেশে গভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের পথে দেশবাসীকে অগ্রসর হইতে আহ্বান জানান।)



অশ্বিনীকুমার দত্ত

স্বদেশী আন্দোলনের বিলাতী বর্জন কর্মসূচীতে যে-বৈপ্লবিক তাৎপর্য ও তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা নিহিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সম্ভবত ঐ কারণেই বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের বিশেষত বিপিনচন্দ্র পালের বলিষ্ঠ আবেদন-সত্ত্বেও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের কাশী অধিবেশনে স্বদেশী সমর্থিত হইলেও বিলাতী বর্জনের প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করে নাই। কিন্তু ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসে চরম-পন্থীদের বা জাতীয়তাবাদীদের সমর্থক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী ও নরম বা মধ্যপন্থীদের মতবিরোধের লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠে। দাদাভাই নওরোজী ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সম্ভবত চরমপন্থীদের প্রভাবে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব সহ স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্বের অধিকারও সম্মেলনে দাবি করেন। এইভাবেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের আন্দোলনে ক্রমশ রূপান্তরিত হয়।

কংগ্রেস ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন



দাদাভাই নওরোজী

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া সর্বভারতে বিস্তার লাভ করে। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক, মধ্যপ্রদেশে খাপার্দে, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় স্বদেশী আন্দোলনের তথা নব জাতীয়তা-বাদের বার্তা প্রচার করেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন যদিও প্রথমে শুধুমাত্র বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য শুরু হয়, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই ঐ আন্দোলনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ লাভ করে।

বঙ্গের বাহিরে আন্দোলনের বিস্তার

ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনের এইরূপ বিস্তারে শঙ্কিত হইয়া একদিকে কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতাদিগকে তোষণ করার নীতি অবলম্বন করেন অন্য-দিকে ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দেন। ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের পরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রচণ্ড সরকারী দমন নীতি প্রয়োগের ফলে স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হইয়া আসে। আর

ভেদনীতি প্রয়োগে আন্দোলনের গতি স্তিমিত

এই সময়েই বাংলাদেশের আবেগপ্রবণ একদল যুবক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পথে অগ্রসর হয়।

ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবী কার্যকলাপে যত ভীতিবোধ করিতেন অন্য কোন আন্দোলনে তত সন্ত্রস্ত হইতেন না। দমন ও ভেদনীতির আশ্রয় লওয়া-সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিপ্লবী যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ভারতে আসিয়া, মধ্যবিত্ত বাঙালীদের সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে, বঙ্গভঙ্গ রহিত করেন। এইভাবে দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে দুই বঙ্গ পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়; কিন্তু নিয়তির এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস, যে-বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে সেই বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

পঞ্চম জর্জ-কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা ঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রথমে বাঙ্গালীর জাতীয় আন্দোলনরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান সকল সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালীগণ বঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা করেন। কলিকাতার মুসলমানগণ আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ২৩-এ সেপ্টেম্বর রাজাবাজারে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একটি সভায় মিলিত হন এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ঢাকার নবাব সলিমউল্লাও প্রথম পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু লর্ড কার্জন নানাভাবে প্ররোচিত করিয়া ও অল্প সুদে প্রচুর অর্থ ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থকে পরিণত করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রসুলের নেতৃত্ব



আব্দুল রসুল

ঢাকার নবাবের প্রভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই আন্দোলনে শিক্ষিত বহু মুসলিম যোগদান করেন। ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল, মৌলভী আবুল কাসেম, লিয়াকৎ হোসেন, আব্দুল হালিম

শিক্ষিত মুসলিমদের সমর্থন

গজনভী-প্রমুখ বিখ্যাত মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে যোগদান করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনায় ধর্মান্ধ মুসলিমদের আন্দোলনের বিরোধিতা

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের গোপন হস্তচালনায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগ প্রতিষ্ঠার পর হইতে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রধান বহু গ্রামে ও শহরে বয়কট আন্দোলন প্রতিহত হইতেছিল। এমন কি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনঃ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রগণ প্রথম হইতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার রংপুর সরকারী বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অপরাধে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করেন। রংপুরের ঘটনায় চিন্তিত হইয়া সুবোধ মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ও জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে স্বীকৃত হন।

জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন-সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে বাংলার সকল কৃতী পুরুষদের এক সম্মেলন হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, নীলরতন সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ ও সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগ দেন। জাতীয় আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি—এই ত্রিবিধ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য National Council of Education বা জাতীয় শিক্ষাপরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে বর্জন না করার অভিমত জ্ঞাপন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা-সম্পর্কে আলোচনা ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠন

জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠনের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি বা Society for the Promotion of Technical Education নামে আর

একটি সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধীনে বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগের কার্যে ইস্তফা দিয়া ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন আর প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি স্যার তারকনাথ পালিতের অর্থসাহায্যে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্মতৎপরতায় জাতীয় শিক্ষাদানের এক ব্যাপক আয়োজন করে। শহর ও মফঃস্বলের অনেক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অনুমোদন লাভ করে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী গৃহীত হয়।

ন্যাশনাল কলেজে অরবিন্দের যোগদান

সতীশ মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতা

সুতরাং, বলা যাইতে পারে যে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরেজ-পরিচালিত 'গোলামখানা' পরিত্যাগ করিয়া দেশবাসীকে স্বদেশের প্রয়োজন-অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ হইতে রাজনৈতিক উত্তেজনা মন্দীভূত হওয়ায়, সরকারী স্কুল হইতে বহিষ্কৃত ছাত্রদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় এবং জাতীয় শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সরকারী চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় জাতীয় বিদ্যালয় তথা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জনপ্রিয়তা ক্রমশ নষ্ট হইয়া যায়।

শিক্ষা আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার কারণ

প্রশ্নমালা

১। বঙ্গভঙ্গের কারণ কি?

২। বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য বাঙ্গালীরা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন?

৩। স্বদেশী আন্দোলন বলিতে কি বুঝায়? কি কারণে এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল? এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৪। স্বদেশী- ও বয়কট-সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

৫। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন বাংলাদেশে এত জনপ্রিয় হইয়াছিল কেন?

৬। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

৭। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ কি? এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নাম কর, ইহা কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিল?

৮। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পরিচয় দাও। সারা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে ইহার প্রভাব উল্লেখ কর।

চতুর্থ অধ্যায়
জঙ্গী জাতীয়তাবাদের বিকাশ

[বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায়]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে। এই আন্দোলনের ফলে ভারতে সংগ্রামশীল বা জঙ্গী জাতীয়তাবাদের দ্রুত বিকাশ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের নব্য হিন্দুত্ব ও পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল এই জঙ্গী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলে এবং কংগ্রেস চরমপন্থীদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন ও বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যের মধ্য দিয়া এই জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজনারায়ণ বসুর লেখায় সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কংগ্রেসকে আবেদন-নিবেদন নীতি পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর জনসংযোগের পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে ইন্দু-প্রকাশ পত্রিকার কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও কর্মসূচীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এমন কি তিনি কংগ্রেসকে জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান বলিতেও অস্বীকার করেন।

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ বিকাশে রাজনারায়ণ বসু

কংগ্রেস সংগঠনের দুর্বল কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির জন্যই দেশে চরমপন্থা বা জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর যে-অভিযোগ ও ক্ষোভ দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহাই ক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আনুকূল্যে চরমপন্থার মধ্য দিয়া বিস্ফোরিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ১৮৮৫-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া দেশের অভাব, অভিযোগ ও দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট বারে বারে আবেদন ও প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া প্রয়োজন-অনুযায়ী নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহার ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী ব্রিটিশ

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কারণ

সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দ ক্রমবর্ধমান জাতীয় অসন্তোষ দূর করার মত সময়োপযোগী বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্রধানত ইহার ফলে দেশে চরমপন্থা বা জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ফলে ও রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয়েও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী জাতীয়তাবাদী মনোভাব শক্তিশালী হইয়া উঠে।

জাপানের হস্তে রাশিয়ার পরাজয়ে ভারতে জঙ্গী মনোভাব বৃদ্ধি

সংগ্রামশীল জাতীয় মনোভাব বিকাশে বালগঙ্গাধর তিলকের অবদান ঃ (চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী দলকে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বলিষ্ঠভাবে সংস্থাপিত করার কৃতিত্ব মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের। তিনি মনে করিতেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিবে এবং কংগ্রেসের মডারেট বা মধ্যপন্থী নেতাদের আবেদন-নিবেদন নীতি ভিক্ষানীতির সমতুল্য এবং ঐ পথে ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতা আসিবে না। স্বরাজ ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার। আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবাসীকে অনিচ্ছুক ব্রিটিশ সরকারের হাত হইতে স্বরাজের অধিকার আদায় করিতে হইবে।

তিলক-কর্তৃক মধ্যপন্থার সমালোচনা


বালগঙ্গাধর তিলক

উনবিংশ শতকের শেষদিকে বোম্বাইয়ে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ আরম্ভ হইলে তিলক ভারতবর্ষের রাজনীতিকে নূতন দিকে পরিচালিত করেন। তিনি 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্রিকায় জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করেন। স্বদেশবাসীদের অন্তরে দেশপ্রেম ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ জাগাইবার জন্য তিনি মহারাষ্ট্রে গণপতি পূজা ও শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত ধর্মীয় উৎসব প্রবর্তনের সমসাময়িক-কালে মহারাষ্ট্রে গোহত্যা নিবারণী সমিতিগুলিও খুব কর্মতৎপর হইয়া উঠে।

মারাঠা ও কেশরী পত্রিকা প্রকাশ

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে পুনার কালেক্টার মিঃ র‍্যাণ্ড ও আর একজন ইংরেজ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তিলককে এই হত্যাকাণ্ডের মূল উৎস মনে করিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারত সরকার তাঁহাকে ১৮ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তিলকের কারাদণ্ড ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কারণ তিলকের কারাবাসের পরে দেশের জন্য দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ দেশপ্রেমের মাপকাঠি হিসাবে পরিগণিত হয়।

তিলকের কারাদণ্ড

মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক যে-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ বাংলাদেশে এবং লালা লাজপৎ রায় পাঞ্জাবে সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।



বিপিনচন্দ্র পাল

বিপিনচন্দ্র পাল একসময়ে ছিলেন নরম বা মধ্যপন্থার সমর্থক। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা বাহির করেন। 'নিউ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক হিসাবে তিনি সেকালের মডারেট বা মধ্যপন্থী নেতাদের আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষে চরমপন্থী নেতাদের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে তিনিই বিলাতী বর্জন বা বয়কট প্রস্তাবের সমর্থনের সময় ব্রিটিশ পণ্যই শুধু নয় ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করেন। অরবিন্দ বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার পূর্বে বিপিনচন্দ্র পালই ছিলেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবলতম প্রবক্তা। বঙ্গভঙ্গের সময় তাঁহার অপূর্ব বাগ্মিতায় বাঙালীরা বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচীকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়া দেশে অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এই সময়ে ভারতবর্ষ যে-নব জাতীয়তাবাদে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে বিপিনচন্দ্র ছিলেন তাহার অন্যতম উদ্গাতা।

চরমপন্থীরা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র পালের অবদান

চরমপন্থী রাজনীতিদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষের স্থান ছিল খুবই উচ্চে।



অরবিন্দ ঘোষ

কংগ্রেসে যখন মডারেট রাজনীতির জয়জয়কার, সেই সময়ে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বোম্বের ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেস অনুসৃত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা আবেদন-নিবেদনমূলক নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন এবং ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবলতম প্রবক্তা হইয়া উঠেন। অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তত্ত্ব হিংসা-বর্জিত ছিল না। অরবিন্দের মতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবস্থা বুঝিয়া সক্রিয় অর্থাৎ সহিংস রূপলাভ করিবে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের পর হইতে বাংলাদেশের চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। চরমপন্থী মতবাদ বা জাতীয়তাবাদ তাঁহার লেখনীস্পর্শে দর্শনের স্তরে উন্নীত হয়।

চরমপন্থী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষের স্থান

পাঞ্জাবের আইনজীবী লালা লাজপৎ রায় ছিলেন নব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। কাশী কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি মডারেট বা মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করেন এবং প্রিন্স অফ ওয়েলসকে (পরবর্তী কালের সম্রাট পঞ্চম জর্জ) ভারতে অভ্যর্থনার জন্য কংগ্রেসে যে স্বাগত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় লালা লাজপৎ রায় তাহার বিরোধিতা করিয়া মধ্যপন্থী নেতাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে কাশী কংগ্রেসে বয়কট প্রস্তাব বা বিলাতী বর্জন প্রস্তাবের সমর্থনে বলিষ্ঠ বক্তব্য উত্থাপন

চরমপন্থী আন্দোলনে লাজপৎ রায়ের অবদান

করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের পদ্ধতি দেশবাসীকে গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান। তিনিই বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের বার্তা পাঞ্জাবে প্রচার করেন এবং জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন।



লালা লাজপৎ রায

বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ রাজনীতিবিদ্‌গণ ভারতে মডারেট রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এই নূতন আন্দোলনকে কেহ কেহ চরমপন্থী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী মতপার্থক্য

চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী বা নরমপন্থীদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, মধ্যপন্থিগণ ভারতবর্ষ যে-স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্য তাহা বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু চরমপন্থীরা মনে করিতেন, স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার, সুতরাং স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য যোগ্যতা অযোগ্যতা বা উপযুক্ত সময় ইত্যাদির প্রশ্ন উঠে না। ভারতবাসী সব সময়ই স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভের যোগ্য। মধ্যপন্থীদের ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন যে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যথেষ্ট যুক্তি-সহকারে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করিতে পারিলে, উপযুক্ত সময়ে সদাশয় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই দাবি পূরণে কার্পণ্য করিবেন না। অন্যদিকে চরমপন্থীরা মনে করিতেন যে, অনুনয় বিনয় বা ভিক্ষাদ্বারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করা যায় না। স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতবাসীকে এই অধিকার প্রদানও করিবেন না। সুতরাং এই অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে। তবে সেই আন্দোলন হইবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন বা **Passive resistance**। মধ্যপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন

ও বিপ্লববাদীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হইতে যাহা হইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে চরমপন্থী উপদল বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে, কারণ ঐ আন্দোলনের ফলে অনেক মধ্যপন্থীও চরমপন্থী হইয়া উঠেন এবং বাঙ্গালী চরমপন্থীদের সহযোগিতার ফলে ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশেও চরমপন্থীরা শীঘ্রই রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। (বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল সর্বভারতীয় নেতারূপে চরমপন্থীদের পরিচালনা করিতে থাকেন এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন) বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল এক যৌথ জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী নেতৃত্বের অভিব্যক্তিরূপে লাল-বাল-পাল এই একটি পরিচয়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

লাল-বাল-পাল

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই চরমপন্থীদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পায় যে, কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী চরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করার জন্য মধ্যপন্থী বা চরমপন্থীদের কয়েকটি প্রস্তাবের সঙ্গে স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাবও গ্রহণ করেন এবং এই অধিবেশনেই স্বরাজলাভই-যে ভারতবর্ষের জাতীয় লক্ষ্য তাহাও ঘোষণা করেন। সভাপতি নওরোজী এক ধরনের স্বরাজের ব্যাখ্যা করিলেন। আর বিপিনচন্দ্র পাল অন্য ধরনের ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বলিলেন যে, ব্রিটিশ শাসন-মুক্ত সম্পূর্ণ অটোনমি বা আত্মশাসনের নামই

কলিকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি


গোপালকৃষ্ণ গোখলে

কলিকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীদের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ফিরোজশাহ মেহতা, গোখলে প্রমুখ মধ্যপন্থীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা কংগ্রেস হইতে চরমপন্থীদের প্রভাব দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারও চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে মধ্য-

চরমপন্থীর উপর সরকারী নিপীড়ন

পন্থীদের সমর্থন করার নীতি গ্রহণ করেন, ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়- রাজরোষে পতিত হন।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা হয়। ইহার অল্পদিন পূর্বেই লালা লাজপৎ রায় কারাগার হইতে মুক্ত হওয়ায় চরমপন্থীরা তাঁহাকে সভাপতি করিতে চাহেন। কিন্তু লালাজী সরকারের কুনজরে পড়িয়াছেন বলিয়া নরমপন্থীরা বা মধ্যপন্থীরা তাঁহাকে ঐ পদে বরণ করিতে রাজী হইলেন না। অন্যদিকে মধ্যপন্থীরা কংগ্রেসে তাঁহাদের প্রাধান্য বলবৎ রাখার জন্য হঠাৎ সম্মেলনের স্থান সুরাটে পরিবর্তন করিলেন ; কারণ সুরাটে মধ্যপন্থীদের আধিপত্য ছিল।

সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত

(সুরাট কংগ্রেসে ফিরোজশাহ মেহতা, গোখ্‌লে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যপন্থীদের নেতৃত্ব করেন আর চরমপন্থীদের নেতৃত্ব করেন বাল গঙ্গাধর তিলক।) রাসবিহারী ঘোষকে সুরাটের কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত করা হইলে মঞ্চে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সভাস্থলে এক পাটি জুতা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সভা ভাঙিয়া যায়। মধ্যপন্থীরা কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র রচনা করায় চরমপন্থীরা কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

নরম বা মধ্যপন্থীদের ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন

ব্রিটিশ সরকার মধ্যপন্থীদের মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তন করিয়া তোষণ করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় চরমপন্থীদের উপর নানাপ্রকার নির্যাতন শুরু হয় এবং ইহার ফলে চরমপন্থীরা সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ভারতবাসীর রাজনৈতিক বিক্ষোভ সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।*



রাসবিহারী ঘোষ

* এই অধ্যায়ে কংগ্রেসের মডারেটদের কোথাও মধ্যপন্থী, কোথাও নরমপন্থী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক সংগ্রাম

বাংলায় বৈপ্লবিক কার্যকলাপ: রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ মনীষীদের রচনা ও প্রচারণায় ভারতবর্ষে যে-সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক বা সন্ত্রাস-বাদী আন্দোলনের উৎপত্তি। ইংরেজ প্রভুত্ব ধ্বংস করার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে রাজনারায়ণ বসু 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি সভা ইটালীর কার্বোনারী সঙ্ঘের আদর্শে গঠন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্মপরিচয়'-এ এই সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন,

বৈপ্লবিক আন্দোলনের পটভূমিকা ও সঞ্জীবনী সভা

"জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো-বাড়িতে তার অধিবেশন; ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।"[১]

বাহ্যত ব্যায়াম শিক্ষা, জনসেবা প্রভৃতি সামাজিক কার্যের জন্য বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে বহু ব্যায়াম সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালীরা-যে 'ভেতো বাঙ্গালী নয়', ভীরু ও কাপুরুষ নয় সম্ভবত তাহা প্রমাণ করাও এই সমস্ত ব্যায়াম সমিতিগুলির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমস্ত সমিতিতে তরুণদের লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, যযুৎসু প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত চরিত্র গঠনের জন্য ভগবদ্গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ-পাঠও এই সমস্ত সমিতির সদস্যদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। গীতার অন্তর্গত আত্মার অবিনশ্বরতা-সম্পর্কিত শ্লোকটিও[২] তখনকার দিনের তরুণদের অনেকেরই কণ্ঠস্থ ছিল। 'বর্তমান রাজনীতি', 'মুক্তি কোন্ পথে', 'শিখের বলিদান', 'দেশের কথা', 'শিবাজী' ও 'মাৎসিনির জীবনী', 'বোমা প্রস্তুত প্রণালী' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালী তরুণগণ মাতৃভূমির পরাধীনতার স্বরূপ ও সেই পরাধীনতা দূর করার মত ও পথের সন্ধান লাভ

বৈপ্লবিক আন্দোলনে ব্যায়াম সঙ্ঘগুলির অবদান ও বৈপ্লবিক মানস গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা

১. *Vide* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন', p. 232

২. বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

করেন। কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ যাহাতে সরকারের দৃষ্টিগোচর না হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। এই সমস্ত সমিতির প্রধান সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বোমা তৈয়ারী, বোমা নিক্ষেপ ও বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কৌশল জানিতেন। ডাকাতি করিয়া অথবা দেশের ধনীদের নিকট হইতে চাপ দিয়া গোপন সমিতি পরিচালনার অর্থ এই সমস্ত সমিতির সদস্যগণ প্রায়ই সংগ্রহ করিতেন।

গুপ্তসমিতির ভূমিকা

বঙ্গভঙ্গের সময় দুই বাংলায় এই রকম অসংখ্য গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। নব গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে স্থাপিত গুপ্ত সমিতির মধ্যে পাঁচটি ছিল বিশেষ শক্তিশালী। (১) অনুশীলন সমিতি। পূর্ববঙ্গে এই সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ঢাকা শহরে, এবং ইহার প্রধান সংগঠক ছিলেন পুলিনবিহারী দাস। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা সমিতির অধীনে ছিল ১১৬টি শাখা ও সদস্যসংখ্যা ছিল ৮৪০০। (২) স্বদেশ বান্ধব সমিতি। ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বরিশাল। (৩) সুহৃদসমিতি। প্রধান কর্মকেন্দ্র ময়মনসিং। (৪) ব্রতী সমাজ ও (৫) সাধনা সমাজ। গুপ্ত হত্যা, ডাকাতি ও নানাবিধ হাঙ্গামা করিয়া আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোই ছিল এই সমস্ত সমিতিগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। পশ্চিম বাংলায়ও অনুরূপ বহু সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনুশীলন সমিতি ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন ইহার প্রধান সংগঠক, ঢাকার অনুশীলন সমিতি কলিকাতা সমিতিরই শাখা হিসাবে প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের পাঁচটি প্রধান গুপ্তসমিতির নাম

অনুশীলন সমিতির বারীন্দ্রনাথ ঘোষ

বঙ্গবিভাগের পরে সৃষ্ট নবগঠিত বঙ্গদেশের ছোটলাট এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন বিধ্বস্ত করার যে-ব্যর্থ চেষ্টা হয় তাহাই বাংলার বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। ইহার পর বাংলাদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুইজন বিপ্লবী মজঃফরপুরে কলিকাতার ভূতপূর্ব চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিতে গিয়া দুইজন নিরীহ ইংরেজ মহিলাকে বোমার আঘাতে হত্যা করেন। পুলিশের হাতে ধরা না দিয়া প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন; ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়েন। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়। স্বদেশ-মাতার বন্ধন

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী

মোচন করার জন্য ক্ষুদিরামই প্রথম ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। এই ঘটনার পরে কলিকাতার পুলিশ মানিকতলায় বোমা-নির্মাণের কারখানা আবিষ্কার করেন। অরবিন্দ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বিপ্লবীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দ ঘোষকেও ঐ দিনই গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুর বোমার মামলা নামক বিখ্যাত মামলায় দীর্ঘদিন ধরিয়া এই সমস্ত বিপ্লবীদের বিচার চলে। এই মামলা চলার সময়ে আরও কয়েকটি দুঃসাহসিক সন্ত্রাসমূলক কার্যের

অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার

আলিপুর বোমার মামলা


ক্ষুদিরাম বসু

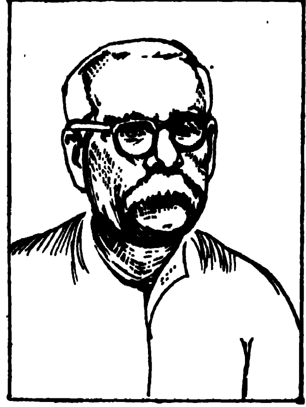

কানাইলাল দত্ত

অনুষ্ঠান হয়। আলিপুর বোমার মামলার আসামী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী হঠাৎ রাজসাক্ষী হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত বাহির হইতে রিভলভার আনাইয়া বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষীকে জেলের মধ্যেই ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে হত্যা করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারত সরকার আলি-পুরের বোমার মামলা দায়ের করিয়া ও সত্যেন ও কানাইকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের বিপ্লবীদের ধ্বংস করিয়াছেন। সরকার বাহাদুরের এই ভুল ধারণা ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় নাই। কানাইলাল ও সত্যেনের মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস ও ক্ষুদিরামকে যে-দারোগা গ্রেপ্তার করিয়াছিল অনতিবিলম্বে তাঁহাদের হত্যা করিয়া বাংলার বিপ্লবীরা প্রমাণ করিলেন যে, তাঁহাদের নির্মূল করা সহজ নয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্তের ফাঁসি

অরবিন্দকে আলিপুরের মামলায় জড়িত করিয়া বিচার করা হয়, কিন্তু ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের ওকালতির গুণে তিনি মুক্তিলাভ করেন। আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের মধ্যে বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অন্যান্য বিচারাধীন বন্দীর বিভিন্ন মেয়াদী দণ্ড হয়।

বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড


বারীন্দ্রনাথ ঘোষ

বাংলার বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক কার্যের তালিকা খুবই বিরাট। পূর্ববঙ্গে ও আসামে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার বিপ্লবীদের উপর সর্বপ্রথম নানাপ্রকারের নিপীড়ন শুরু করেন। অতঃপর ভারত সরকারও বিপ্লবীদের দমন করার জন্য নিপীড়ন শুরু করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার দুই বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাসনে প্রেরণ করেন এবং দুই বঙ্গের সাতটি সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। নির্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক কর্মে যিনি জড়িত ছিলেন তিনি হইলেন ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান পুলিনবিহারী দাস। পরিসংখ্যানে প্রকাশ যে, ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে ৮টি স্বদেশী ডাকাতি হয়। ১৯০৯-১০ খ্রীস্টাব্দে হয় ১৭টি। পিটুনী পুলিশ বসানো হয় যশোহর, খুলনা, ঢাকা ও অন্যান্য বহু স্থানে। বহু যুবককে এই সকল ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। 'নবশক্তি', 'সন্ধ্যা', 'হিতবাদী', 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর' প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয়। সরকার 'রাজদ্রোহাত্মক

বাংলাদেশে সরকারী নিপীড়ন

পুলিন দাস গ্রেপ্তার


পুলিনবিহারী দাস

সভা সমিতি নিবারণ আইন', 'বিস্ফোরক আইন', 'ভারতীয় অপরাধ আইন' প্রভৃতি নানাবিধ আইন জারী করিয়া বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ করিবার প্রয়াস পান। ইহার ফলে বিপ্লবীদের কর্ম-তৎপরতা পূর্ববঙ্গে অনেকটা ম্লান হইয়া পড়ে।

সন্ত্রাস-দমনে দমন-মূলক আইন প্রয়োগ

বঙ্গভঙ্গের ফলেই-যে ভারতে চরমপন্থীরা ও বিপ্লবীরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিতে ভারত সরকারের পক্ষে বেশি বিলম্ব ঘটে নাই। ভারতের বিক্ষুব্ধ জনমত শান্ত করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করেন এবং ঐ সময়ে দিল্লীতে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজকীয় আড়ম্বরে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৩-এ ডিসেম্বর যখন নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেন ঠিক সেই সময়ে তাঁহার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং তিনি আহত হন। লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের ফাঁসি হয় ও দুই জন সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ

গভর্নমেণ্ট এই সমস্ত কার্যের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে রাসবিহারী বসুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। তিনি ছদ্মবেশে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করেন।

ফেরারী রাসবিহারী বসু



বাঘা যতীন

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় বাংলা-দেশের বিপ্লবীরা আবার প্রাণবন্ত হইয়া উঠেন। এই সময়ে বাংলা-দেশে বিপ্লবীদের অধিনায়কতা করেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে 'সাংহাই'-এর জার্মান কন্সাল অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করিয়া দুইটি জাহাজ

প্রথম মহাযুদ্ধে বিদেশ হইতে সাহায্য লাভের প্রয়াস

বাংলাদেশে পাঠান। একখানা সুন্দরবনের রাইমঙ্গলে ও অন্যটি বালেশ্বরে পৌঁছাইবে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ভারত সরকার এই ষড়্‌যন্ত্রের কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়া বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর বুড়ি বালামের তীরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী নিহত হন, মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছদ্মবেশে বিদেশে পলায়ন করেন। এই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যই পরে এম. এন. রায় নামে পরিচিত হন।

বুড়ি বালামের খণ্ড-যুদ্ধ ও বাঘা যতীনের মৃত্যু

মহারাষ্ট্রে বৈপ্লবিক সংগ্রামঃ ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রে আরম্ভ হইয়াছিল। (উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে চিৎপাবন-বংশীয় ব্রাহ্মণ বাসুদেও বল্‌বন্ত ফাড়্‌কে গুপ্তসমিতি গঠন করিয়া সশস্ত্র উপায়ে ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছেদের ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন) এই উদ্দেশ্যে তিনি অস্ত্র সংগ্রহও করিয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁহার ধারণা সময়ের অনেক অগ্রবর্তী ছিল সেইজন্য তিনি মহারাষ্ট্রে প্রভাবশালী কাহারও নিকট বিশেষ কোন সাহায্য পান নাই। এককভাবে তিনি ষড়্‌যন্ত্র করিয়া ও ব্যর্থ বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়া ব্রিটিশ জেলে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। (ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাসুদেও বল্‌বন্ত ফাড়্‌কে-কে ভারতে জঙ্গী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের জনক-রূপে অভিহিত করেছেন।*)

জঙ্গী জাতীয়তাবাদের জনক বাসুদেও বলবন্ত ফাড়্‌কে

ফাড়্‌কের মৃত্যুর ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্রে আর কোন বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান ঘটে নাই, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 'গণপতি পূজা' ও 'শিবাজী উৎসব' প্রভৃতি অনুষ্ঠান পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রে উগ্র জাতীয়তাবোধ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ঐ সময়েই মহারাষ্ট্রে অনেক গুপ্ত সমিতিও স্থাপিত হয়। এই সমস্ত গুপ্ত সমিতিতে সদস্যগণের দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রতি যেমন নজর রাখা হইত, তেমনি সদস্যগণকে সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হইত। মহারাষ্ট্রে এই সমস্ত কার্য-কলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই ভাই। তাঁহারা ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-

গুপ্তসমিতি স্থাপন

* R. C. Mazumder, *History of Freedom Movemeat*, Vol. I, p. 452.

বংশীয়। ব্রিটিশদের মহারাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত করিয়া মারাঠাদের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্লেগ-রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্লেগ নিবারণের নামে সরকারী কর্মচারীরা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন করেন এবং এই উৎপীড়ন মিঃ র‍্যাণ্ড নামক ব্রিটিশ কর্মচারীর নেতৃত্বেই বেশি অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় মিঃ র‍্যাণ্ড ও আর একজন ইংরেজকে হত্যা করেন। বিচারে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হয়। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে যাহারা পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিয়াছিল ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে চাপেকারের দলভুক্ত সদস্যগণ তাহাদিগকে হত্যা করেন। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর ফলে মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি

মহারাষ্ট্রে পরবর্তী বৈপ্লবিক বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নায়ক ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার ও তাঁহার ভাই গণেশ সাভারকার। বিনায়ক সাভারকার শৈশবেই তিলক ও পরাঞ্জপের লেখা পড়িয়া সংগ্রামশীল জাতীয় মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হন। পরে ইটালী, রুশিয়া ও আয়ারল্যাণ্ডের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস পড়িয়া সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থক হইয়া উঠেন এবং ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গোপন সমিতি স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতির নাম ছিল 'মিত্রমেলা', পরে এই 'মিত্রমেলা'-ই 'অভিনব ভারত' নামে পরিচিত হয়। তাঁহার এই সকল গোপন কার্যকলাপের সঙ্গী ছিলেন তাঁহার ভাই গণেশ সাভারকার। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলিয়া যান এবং সেখানে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহ-সম্পর্কে একটি নূতন ধরনের গ্রন্থ লেখেন এবং উহার নামকরণ করেন 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম'। 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ সমাগত ভারতীয়দের অনেকেই তাঁহার অনুপ্রেরণায় বোমা নির্মাণ পদ্ধতি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা করিত। ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলি দিয়া তিনি ভারতে ২০টি ব্রাউনিং পিস্তল প্রেরণ করেন।

বিনায়ক সাভারকারের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ

বিনায়কের ইংল্যাণ্ডে বিপ্লববাদ প্রচার

তাঁহার ভাই ভারতে থাকিয়া বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পূর্ণোদ্যমে পরিচালনা করিতেন। বাংলাদেশে যখন মানিকতলা বোমার মামলা চলিতেছিল তখন

গণেশ সাভারকারকে রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। ইংল্যাণ্ডে বিনায়কের নিকট যথাসময়ে এই সংবাদ গিয়া পৌঁছায়। ইহা লইয়া 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সম্ভবত এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মদনলাল ধিংড়া নামে জনৈক পাঞ্জাবী যুবক 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর কর্মী কার্জনওয়ালী নামক ইংরেজকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। গণেশ সাভারকারের রাজদ্রোহ মামলার বিচারক ছিলেন নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন। জ্যাকসন ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বিনায়কের প্রেরিত ব্রাউনিং পিস্তলের গুলিতে নিহত হন।

মদনলাল ধিংড়া-কর্তৃক কার্জনওয়ালীকে হত্যা

নাসিক ষড়্‌যন্ত্র মামলা

এই ঘটনার পর নাসিক ষড়্‌যন্ত্র মামলা দাঁড় করাইয়া ৩৮ জন মহারাষ্ট্রীয় যুবককে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে ২৭ জনের নানাপ্রকার শাস্তি হয়। নাসিক ষড়্‌যন্ত্র মামলার সময় ইংল্যাণ্ডের বিপ্লবী দলের সঙ্গে মারাঠী বিপ্লবীদের যোগাযোগের ঘটনা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

ইহার পর আমেদাবাদে বড়লাট মিণ্টো ও লেডি মিণ্টো আসিলে তাঁহাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিল যে, মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মূল হইলেন ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী বিনায়ক সাভারকার। পুলিশ বিনায়ককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য একটি জাহাজে ভারতের দিকে প্রেরণ করে। জাহাজটি একটি ফরাসী বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইলে বিনায়ক সাভারকার সমুদ্রে লাফাইয়া পড়েন ও সাঁতরাইয়া ফরাসী দেশে আশ্রয় লন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরাসী পুলিশ উৎকোচ লইয়া তাঁহাকে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে অর্পণ করে। বিচারে বিনায়কের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সাভারকারের দ্বীপান্তরের পর হইতে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা স্তিমিত হইয়া আসে।

বিনায়ক সাভারকার গ্রেপ্তার ও জাহাজ হইতে পলায়ন

বিনায়ক সাভারকারের দ্বীপান্তর

পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপঃ ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে **Sedition Committee**-র যে-রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহার বেশির ভাগ অংশ জুড়িয়া বাংলাদেশের বৈপ্লবিক কাহিনী বিবৃত রহিয়াছে। বোম্বাই-এর জন্য প্রথম চৌদ্দ পাতা আর পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী কাহিনী ২০ পাতার মধ্যে শেষ হইয়াছে। পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের তৎপরতা বর্ণনার প্রসঙ্গে একথা মনে

রাখিতে হইবে যে, পাঞ্জাবী বিপ্লবীরা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া দীর্ঘদিন কাজ করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে পাঞ্জাবই ছিল ব্রিটিশদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাবে রাজনৈতিক অসন্তোষ ধীরে ধীরে প্রবল আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ পাঞ্জাবেও প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

পাঞ্জাবে প্রথম অসন্তোষ দেখা দেয় রাওয়ালপিণ্ডিতে। ব্যাপারটি ছিল রাজস্ব-বিষয়ক, কিন্তু রাজস্ব-বিষয়ক অসন্তোষ শীঘ্রই দাঙ্গায় পরিণত হয়।

রাওয়ালপিণ্ডিতে দাঙ্গা

উত্তেজিত জনতা পিণ্ডির ডাকঘর লুণ্ঠন করে এবং একটি গির্জা ভাঙিয়া ফেলে। এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মূল উৎস মনে করিয়া লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিংকে পাঞ্জাব সরকার দেশ হইতে নির্বাসিত করেন। ছয় মাস পরে উভয়ে মুক্ত হন। কিন্তু আরও ব্যাপকভাবে বৈপ্লবিক কর্ম পরিচালনার জন্য সর্দার অজিত সিং ভারত ত্যাগ করেন।

লাজপৎ রায় ও অজিত সিং গ্রেপ্তার

পাঞ্জাবে পরবর্তী কালে যে-বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয় তাহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভাই পরমানন্দ ও হরদয়াল। তাঁহারা উভয়ে কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যাণ্ড গিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের অন্যতম নেতা শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ভাই পরমানন্দ সরকারের চোখে একজন ভয়ঙ্কর বিপ্লবী-রূপেই আজীবন প্রতিভাত হইয়াছেন, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ভাই পরমানন্দ তাঁহার সঙ্গে কোন বিপ্লবী দলের সংস্রব নাই বলিয়া বারে বারে উল্লেখ করিয়াছেন। হরদয়াল দেশে ফিরিয়া পাঞ্জাবী যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাব জাগ্রত করেন এবং কিছুদিন পরে আমেরিকায় চলিয়া যান। তিনি কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী পাঞ্জাবী তথা ভারতীয়দের মধ্যে 'গদর' বা বিদ্রোহভাব জাগরিত করেন এবং 'গদর' পার্টি গঠন করেন। গদর পার্টির অন্যতম কর্মসূচী ছিল, প্রবাসী ভারতীয়দের বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এইরকম ভাবে অনেককেই গদর পার্টি ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য প্রেরণ করিয়াছে।

ভাই পরমানন্দ ও হরদয়ালের পরিচয়

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে বিষ্ণু গণেশ পিংলে নামক এক মারাঠী যুবক বহুকাল আমেরিকায় বসবাস করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতবর্ষে এক মহাবিপ্লব বা বিদ্রোহ সৃষ্টি করা ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার ষড়্‌যন্ত্রের ব্যর্থতার পরে বাঙ্গালী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত শিখরাও পাঞ্জাবে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও রাসবিহারী বসু শিখদের সঙ্গে যোগ দিয়া সৈন্য-বাহিনীতে বিদ্রোহের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।



রাসবিহারী বসু

বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও রাসবিহারী বসুর ভারতীয় সৈন্য দলে বিদ্রোহ সংঘটনের প্রয়াস

কর্তার সিং, পিংলে প্রভৃতি বিপ্লবীরা লাহোর, আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, মীরাট প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যদলকে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করেন। রাসবিহারী তাঁহার কয়েকজন সহকারীকে বেনারস, এলাহাবাদ, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানের সেনানিবাসে প্রেরণ করেন। স্থির হয় যে, ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ শুরু হইবে, কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি পুলিশের নিকট এই ষড়্‌যন্ত্রের কাহিনী প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহার ফলে পিংলে বোমা-সমেত ধরা পড়েন, বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়। রাসবিহারীর বাসস্থান তল্লাসী করিয়া পুলিশ প্রচুর গুলি, বারুদ, অনেক রিভলবার আবিষ্কার করিল। রাসবিহারী বসু পুনরায় ফেরার হইলেন ও ছদ্মবেশে জাপান পলায়ন করিলেন। পুলিশ লাহোরের এই বিপুল বিপ্লব-প্রচেষ্টার আভাস পাইয়া অতি ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসী করিয়া একটি মামলা দাঁড় করাইল। ইহাই লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা নামে বিখ্যাত। বিচারে ষড়্‌যন্ত্রকারী নাম দিয়া ভারত সরকার ২৮ জন দেশপ্রেমিককে ফাঁসি দিল। অনেককে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিল; শুধুমাত্র ২৯ জন মুক্তিলাভ করিল। বিশিষ্টদের মধ্যে ভাই পরমানন্দের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল। লাহোর ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় পাঞ্জাবে বিপ্লবের আশাও নির্বাপিত হইল।

লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা

পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা 'কামাগাটামারু' ঘটনায় একসময় স্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় প্রবাসী পাঞ্জাবীদের প্রতিষ্ঠিত 'গদর' পার্টির সঙ্গে সংস্রব আছে এই অজুহাতে জাপানী জাহাজ 'কামাগাটামারু'তে যে-চারি শত শিখ কানাডায় স্থান না পাইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন তাঁহাদিগকে বজবজে লইয়া যাওয়া হয় এবং বিশেষ এক ট্রেন-যোগে তাঁহাদিগকে পাঞ্জাবে প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। কানাডার ইংরেজদের অশিষ্ট আচরণে বিক্ষুব্ধ শিখগণ ভারতে আসিয়া এখানকার ইংরেজ সরকারের ব্যবহারে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং বজবজে পুলিশের সঙ্গে শিখদের এক খণ্ড যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে অনেকে হতাহত হন এবং অনেকে ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করেন।

কামাগাটামারু জাহাজের যাত্রীদের বজবজে আনয়ন ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করা-যে সহজসাধ্য নয়, তাহা বিপ্লবীরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই আলিপুর বোমার মামলার পরে বিপ্লবীদের অনেকেই বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সহানুভূতি ও সাহায্যে ভারতের মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করেন। ইহার ফলে শীঘ্রই লণ্ডন, প্যারিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, সুইজারল্যাণ্ড, বার্লিন প্রভৃতি শহরে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিদেশে ভারতের বিপ্লববাদকে যাঁহারা জনপ্রিয় করিয়াছিলেন ও বিদেশ হইতে ভারতে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরকতউল্লা, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ওবেদুল্লা সিন্ধী, অবনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তবে এই প্রসঙ্গে ম্যাডাম কামা নামে এক তেজস্বিনী পারসিক মহিলার নাম অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি অর্থ ও আশ্রয় দিয়া প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের নানা ভাবে সাহায্য করেন।

বিদেশে বিপ্লবী প্রচেষ্টা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহানুভূতি অর্জন করিতে পারেন নাই, কিন্তু যুদ্ধের সময় জার্মান সরকার নিজস্ব প্রয়োজনেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। ইহার ফলে প্রবাসী বিপ্লবীরা বার্লিন নগরে একটি কমিটি গঠন করেন। এই সময়ে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা

তুরস্ক ছিল ব্রিটিশের শত্রু দেশ, আর আফগানিস্তানও ছিল শত্রুভাবাপন্ন। ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই তুরস্ক, আরব ও আফগানিস্তানে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও বরকতউল্লা কাবুলে এক 'অস্থায়ী ভারত সরকার' গঠন করেন। মুসলিম ধর্মনেতা মৌলানা মামুদ হাসান ইংরেজের যুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করেন। জার্মানি, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের সহযোগিতায় উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় ভারতীয় বিপ্লবীদের বিরাট পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এবং ইহার পর ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া পড়ে।

কাবুলে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন

প্রশ্নমালা

১। জঙ্গী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ বলিতে কি বুঝায়? জঙ্গী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২। ভারতে চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ভবের কারণ বর্ণনা কর।

৩। চরমপন্থী কয়েকজন নেতার কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিলকের অবদান বর্ণনা কর।

৫। চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীদের রাজনৈতিক মত-পার্থক্য নির্ণয় কর।

৬। চরমপন্থা কি? চরমপন্থার সঙ্গে মধ্যপন্থার পার্থক্য কি ছিল? অরবিন্দ ঘোষ চরমপন্থা বিকাশে কতদূর সহায়তা করিয়াছিলেন?

৭। কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীদের বিরোধের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৮। বাংলাদেশে বিপ্লববাদের সূচনা কিভাবে হইয়াছিল? গুপ্ত সমিতিগুলি বাংলাদেশে বিপ্লববাদ প্রসারে কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল?

৯। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতার বিবরণ দাও।

১০। মহারাষ্ট্রে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সূচনা কখন হয়? মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক কার্যকলাপে দামোদর বিনায়ক সাভারকারের ভূমিকা আলোচনা কর।

১১। পাঞ্জাবের বিপ্লববাদীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কি জান?

১২। কোন্ কোন্ বিদেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন? এই প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থ হয়?

পঞ্চম অধ্যায়

নূতন নেতা : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস : প্রথম মহাযুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে শুধু নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গ্রেট ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য উপনিবেশের মত ভারতবর্ষকেও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা ব্যতীত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের চিত্র কোনক্রমেই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। চরমপন্থী ও নরমপন্থী বিরোধের ফলে জাতীয় কংগ্রেস দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। চরমপন্থীরা তখনও দলবদ্ধ হইতে পারেন নাই। বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেশে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন করার মত ইচ্ছা নরমপন্থী বা মধ্যপন্থী কংগ্রেসের নেতাদের ছিল না। বরং মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ এই সময়ে ব্রিটিশদের তোষণে ব্যস্ত ছিলেন। ইঁহারা ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে সমর্থন করেন।* ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারা স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের মত রাজানুগৃহীত ব্যক্তিকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করিয়া রাজানুগত্যের চূড়ান্ত পরিচয় দেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে 'ভারত রক্ষা আইন' বিধিবদ্ধ করেন এবং বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে শত শত যুবককে বিপ্লবী সন্দেহে অন্তরীণ করেন। এই মহাযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ভারতীয় মুসলমানদের দাসসুলভ ব্রিটিশ-ভক্তির ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। তাহারা কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হইতে রাজী হয়।

স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কংগ্রেসের সভাপতি



স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

* বাল গঙ্গাধর তিলকও যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষকেই সমর্থন করেন।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। ঐ বৎসরেই ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দুইটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, তিলক ও তাঁহার চরমপন্থী অনুগামিগণ কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগদান করেন এবং মধ্যপন্থী বা নরমপন্থীদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন এবং কংগ্রেসে চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। মুসলিম লীগের অধিবেশন ঐ বৎসর লক্ষ্ণৌ শহরেই অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ শাসন-সংস্কার-সংক্রান্ত—এক খসড়া যৌথভাবে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার চুক্তি করেন। এই চুক্তিই লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে খ্যাত এবং হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের যৌথভাবে ভারতের সংবিধান রচনার ইহাই প্রথম ও শেষ প্রয়াস। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানদের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের পরে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণ জাতীয় স্বার্থে আন্দোলনে অবতীর্ণ হইতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

চরমপন্থী ও নরম-পন্থীদের মিলন

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

হোমরুল আন্দোলন বা স্বরাজ আন্দোলন : ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের আর একটি বিখ্যাত ঘটনা হোমরুল আন্দোলন বা স্বরাজ আন্দোলন। তিলক ও অ্যানি বেসান্ত ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে একই আদর্শ ও লক্ষ্যাশ্রয়ী দুইটি ভিন্ন ভিন্ন হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, হোমরুল লীগের লক্ষ্য ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। আয়ারল্যাণ্ডে যে-ধরনের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল ভারতবর্ষেও ঐ ধরনের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি আদায় করাই ছিল হোমরুল লীগের আসল উদ্দেশ্য। তৎকালে শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করার মত ক্ষমতা জাতীয় কংগ্রেসের ছিল না। সুতরাং কংগ্রেসের বাহিরে কংগ্রেসের সহায়ক প্রতিষ্ঠানরূপেই হোমরুল লীগগুলি স্থাপন করা হইয়াছিল।

হোমরুল লীগ স্থাপন

হোমরুল আন্দোলন সমগ্র দেশে আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা দূরীভূত হয় এবং ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করায় হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন সত্যিকারের জাতীয় রূপ লাভ করে। ভারত-

সরকার দ্রুত বিস্তারশীল এই আন্দোলনকে চূর্ণ করিবার উদ্দেশে অ্যানি বেসান্ত ও তাঁহার কতিপয় সহকর্মীকে অন্তরীণ করেন এবং সংবাদপত্র ও জনসভা নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শাসকশ্রেণীর উৎপীড়ন ও অত্যাচারে আন্দোলনের গতিবেগ মন্দীভূত না হইয়া অধিকতর শক্তিশালী হয়। হোমরুল আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল, অ্যানি বেসান্ত ও তাঁহার অনুগামীদের উপর সরকারী নির্যাতন শুরু হওয়ায়, বন্দী মুক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নূতন আন্দোলনে সারা দেশ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এমন কি **Passive Resistance** বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনার কথাও কোন কোন রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হইল। কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে দেশবাসীকে আর অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। কারণ ইংল্যাণ্ডে তৎকালীন ভারত-সচিব পদ-ত্যাগ করিলেন এবং মন্টেগু তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। মন্টেগুর এই ঘোষণায় হোমরুল লীগগুলি আশ্বস্ত হইল, এবং আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রত্যাহৃত হইল। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে হোমরুল আন্দোলনের দুইটি অবদান বিশেষ উল্লেখ্য। (১) হোমরুল লীগ হাতে-কলমে স্বরাজ শিক্ষা দিয়া স্বরাজের ধারণা ভারতবাসীর নিকট স্পষ্ট করিয়া তোলে। (২) বিদেশী সরকারের নিকট হইতে কোন কিছু আদায় করিতে হইলে গণ-আন্দোলনের অস্ত্র ব্যবহার যে অবশ্য কর্তব্য এই শিক্ষাও হোমরুল আন্দোলন হইতেই ভারতবাসী লাভ করে।

অ্যানি বেসান্ত

মন্টেগুর ঘোষণা ও হোমরুল আন্দোলনের বিরতি

হোমরুল আন্দোলনের অবদান

যুদ্ধোত্তর কাল ঃ অতাল্পকালের মধ্যেই মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থসঙ্কট আরম্ভ হইল, ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য ভারতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইল। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে এক কোটিরও অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল* যুদ্ধশেষে ভারতীয় সৈন্যরা বেকার হইয়া দেশে ফিরিল। উপরন্তু

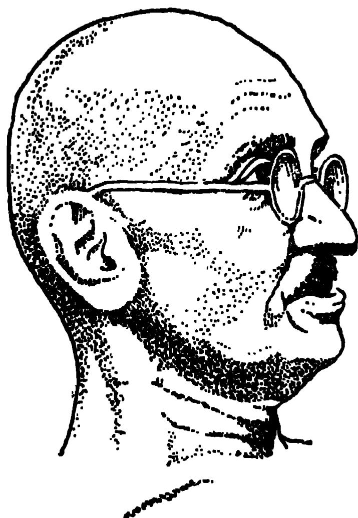
---

* Michael Edwardes, *The Last Years of British India*, p. 41.

করভার বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তখন অসন্তোষ চতুর্দিকে ধূমায়িত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের উৎপীড়নমূলক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করিয়া তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী : গান্ধীজীর জন্ম হয় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দরে। দেশে সাধারণ শিক্ষা লাভ করার পর তিনি মাত্র ২১ বৎসর বয়সে ইংল্যাণ্ডে ব্যারিস্টারি পড়িতে যান। তিন বৎসর পর দেশে ফিরিয়া তিনি রাজকোটের দেশীয় রাজার আদালতে ব্যারিস্টারি শুরু করেন, কিন্তু আইন ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। এই সময়ে প্রবাসী ভারতীয়দের এক মামলা উপলক্ষে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন এবং প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি অনুষ্ঠিত উৎপীড়নের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিয়া সাফল্য অর্জন করেন। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতে চলিয়া আসেন এবং গোপালকৃষ্ণ গোখ্লের পরামর্শে এক বৎসর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া দেশের সমস্যা সম্যক্ উপলব্ধি করেন। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক মতাদর্শে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে তিনি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ভারতবর্ষ হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি ইংরেজদের যুদ্ধোদ্যমে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেন।

গান্ধীজীর পূর্ব পরিচয়



মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ যখন হোমরুল আন্দোলনের উত্তাপে

উত্তপ্ত গান্ধীজী তখন নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য চম্পারণে আসিয়া 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের প্রস্তুতি করিতে থাকেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিবার পূর্বেই তদন্তের ফলে সরকার নীলচাষীদের দুরবস্থা-সম্পর্কে অবহিত হন এবং উহা প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। অত্যল্পকাল পরেই তিনি আমেদাবাদের বয়ন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং আন্দোলনকে সফল করিবার উদ্দেশে অনশন শুরু করেন। ইহার ফলে আমেদাবাদের মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আপোস রফা করিতে বাধ্য হন। অতঃপর গান্ধীজী গুজরাটের অন্তর্গত খেড়া জেলার উৎপীড়িত, খাদ্যাভাবক্লিষ্ট প্রজা-পুঞ্জের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদের দেয় খাজনা মকুবের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিলেন। সরকার খেড়া অঞ্চলের প্রজাদের অনেকগুলি দাবি মানিয়া লইলেন। গান্ধীজী এইভাবে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকারের সংগ্রাম যুক্ত করিয়া শ্রমিক-কৃষকদের ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের শরিক করিয়া লইলেন এবং ভারতীয় জনতার নেতা-রূপে আবির্ভূত হইলেন। অতঃপর ভারতের মুক্তি আন্দোলন শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না। কৃষক, শ্রমিক তথা ভারতবর্ষের মূক জনতার রক্তধারায় ভারতের জাতীয় আন্দোলন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। অনতিকালের মধ্যেই গান্ধীজীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইল।

চম্পারণে গান্ধীজী

গান্ধীজীর অনশন

খেড়া সত্যাগ্রহে গান্ধীজী

ব্রিটিশ-শাসন সম্পর্কে মোহমুক্তি ও অত্যাচারী ব্যবস্থার প্রতিবাদঃ প্রথম মহাযুদ্ধ-অবসানের পরে ভারতবর্ষে যে-বিস্ফোরণমুখী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা আয়ত্তে আনিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার যুগপৎ দমন ও তোষণ নীতি অনুসরণ করেন। দেশের মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদ্‌গণকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশে মন্টেগুর ঘোষণা-অনুযায়ী ভারত সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের জন্য অগ্রসর হন। তবে প্রস্তাবিত সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শাসনক্ষমতা ভারতস্থ ইংরেজ সরকারের হাতে রাখিয়া কোনক্রমে দেশীয় জনপ্রতিনিধিদের দেশের শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকারের ক্ষমতা পূর্ববৎ থাকিবে, কিন্তু শাসন-কৌশলের রূপান্তর

ঘটিবে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে এই ধরনের শাসনব্যবস্থাই ভারত-সংস্কার আইন নামে বিধিবদ্ধ হয়। ইহা সাধারণের নিকট ডায়ার্কি বা দ্বৈত শাসন, মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার বা মন্ট-ফোর্ড সংস্কার নামেও পরিচিত। দেশের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে সকলেই হয়তো এই শাসন-সংস্কারকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিস্ফোরণমুখী আবহাওয়া দেশে নূতন শাসনতন্ত্র-প্রবর্তনের অনুকূল ছিল না। তদুপরি ভারত সরকার রাউলাট অ্যাক্ট নামে একটি কুখ্যাত আইন প্রণয়ন করিয়া বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপের মত নির্বুদ্ধিতার কাজ করিলেন।

ভারত-সংস্কার আইন

রাউলাট আইন

এই সময়ে বিপ্লবী অরাজকতা ও সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ভারত সরকার মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ-অনুযায়ী একটি 'কালাকানুন' প্রবর্তন করেন। মূলত এই আইন ভারতবাসীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করার উদ্দেশেই রচিত হয়। রাউলাট আইনটি যখন আলোচনার স্তরে তখনই এই আইনটিকে প্রত্যাহার করার জন্য কাগজপত্রে আন্দোলন শুরু হয়। ঐ সময়েই ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নবাবির্ভূত নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ঘোষণা করেন যে, আইনটি বিধিবদ্ধ হইলে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। আইনটি ১৮ই মার্চ, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে বিধিবদ্ধ হওয়ায় তিনি বোম্বাইয়ে 'সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠন করিয়া (৩০-এ মার্চ, পরে তারিখ পরিবর্তন করিয়া ৬ই এপ্রিল) 'সত্যাগ্রহে'র প্রারম্ভিক স্তর হিসাবে সারা দেশে 'হরতাল' পালনের আবেদন করেন। ভারতবর্ষের জনতা অপূর্ব উদ্দীপনা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে তাহাদের নূতন নেতার আহ্বানে সাড়া দিল। দেশের নানা স্থানে জনতা ও পুলিশে সংঘর্ষ হইল। দিল্লীতে জনতার উপর গুলি চলিল। জাতির এই সঙ্কটে ধর্মীয় বিভেদ ভুলিয়া হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমান জনতার অনুরোধে দিল্লীর জুম্মা মসজিদের বেদী হইতে বক্তৃতা করিলেন।

রাউলাট আইন-বিরোধী আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড : রাউলাট আন্দোলন দমনের নামে পাঞ্জাব সরকারই সর্বাধিক বর্বরোচিত আচরণ করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের সরকার ৬ই এপ্রিলের সফল হরতালে আতঙ্কিত হইয়া ১০ই এপ্রিল

তারিখে স্থানীয় নেতা ডঃ সত্যপাল ও ডঃ সৈফুদ্দিন কিচ্‌লুকে গ্রেপ্তার করেন।* প্রতিবাদস্বরূপ অমৃতসরে হরতাল পালিত হয় এবং বন্দী নেতৃদ্বয়ের মুক্তির জন্য পরিচালিত শোভাযাত্রার উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করায়, নিরস্ত্র জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া কতকগুলি সরকারী অপিস ও ব্যাঙ্ক অগ্নিদগ্ধ করে। এই ঘটনার পরে অমৃতসরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার পড়ে জেনারেল ডায়ারের উপর। ডায়ার অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৩ এপ্রিল তারিখে আহূত সভায় সমবেত হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নরনারীর উপর সরকারী নিষেধ অমান্যের অজুহাতে অতর্কিতে গুলি বর্ষণ করেন। গুলিবর্ষণের ফলে সরকারী হিসাবে উনআশী জন (বেসরকারী হিসাবে ১০০০ জন) লোক নিহত হয় ও সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এই ঘটনার পর পাঞ্জাবের বহু স্থানে সামরিক আইন বলবৎ করা হয়। পাঞ্জাবে গমনাগমন নিষিদ্ধ হয় এবং সংবাদপত্রে পাঞ্জাব-সম্পর্কিত সংবাদ প্রদানও নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে পাঞ্জাবে অবাধ বর্বরতার রাজত্ব চলিতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ পাঞ্জাব হইতে নির্বাসিত হন। ছাত্র ও শিক্ষকদের নির্বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কোন কোন রাস্তায় পথচারীদের হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়, কোমরে দড়ি ও শিকল বাঁধিয়া অনেক ব্যক্তিকে রাস্তায় পশুর মত ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের নরনারী ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণায়, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে মৃতের সংখ্যা

পাঞ্জাবে বর্বর আচরণ

ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেনের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। কারণ এই ঘটনার পরে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা ও আপোস করিতে রাজী হয় নাই, ইংরেজ-প্রবর্তিত শাসন-সংস্কারেও আস্থা রাখিতে পারে নাই, সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি জেনারেল ডায়ারের বন্দুকের গর্জনের মধ্যে প্রথম শ্রুত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে জালিয়ানওয়ালাবাগের তাৎপর্য

* Dr. Tarachand, Vol. III, p. 947

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়কদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধানের জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে প্রবল দাবি করা হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের উচ্চতর কক্ষ হাউস অফ্ লর্ডস্-এ ডায়ারকে উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করা হয়। এমনকি, ইংরেজ মহিলারা বীরত্ব-প্রদর্শনের জন্য তিন লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়া ডায়ারকে পুরস্কৃত করেন। ইংল্যাণ্ডের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের এহেন আচরণে ভারতবাসীর আত্মমর্যাদা ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়।

ভারতবাসীর এই দুর্দিনে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩-এ ডিসেম্বর তারিখে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার ভারত-সংস্কার আইন নামে বিধিবদ্ধ হয় এবং আইনটি প্রবর্তনের অব্যবহিত পরেই অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। শাসন-সংস্কারটিকে অপর্যাপ্ত, অসন্তোষ-কর ও হতাশাব্যঞ্জক বলিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রস্তাব গৃহীত হইলেও, গান্ধীজীর আগ্রহাতিশয্যে শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের জন্য মন্টেগু সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহার পীড়াপীড়িতেই এই অধিবেশনে আর একটি প্রস্তাবে রাউলাট আন্দোলনে জনসাধারণ যে-হিংসাত্মক কার্যাদি করিয়াছিল তাহার নিন্দা করা হয়। ঐ প্রস্তাব প্রসঙ্গে গান্ধীজী মন্তব্য করেন যে, "ঐ সময়ে শাসন কর্তৃপক্ষ উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন এবং আমরাও উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি বলি, যে-তোমার সঙ্গে উন্মাদসুলভ আচরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি তুমি সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ কর, তাহা হইলে দেখিবে সমস্ত পরিস্থিতিই তোমার আয়ত্তে আসিবে।" এই মন্তব্যের মধ্যে এক নূতন ধরনের জীবন-দর্শনের ইঙ্গিত স্পষ্ট প্রকাশমান, এবং গান্ধীজী এই দর্শনকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।* এই আলোচনার প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পরে আহূত অমৃতসর কংগ্রেসেও গান্ধীজী ব্রিটিশ শাসকবর্গের সঙ্গে অসহযোগিতার কথা চিন্তা করেন নাই, সম্ভবত তখনও ব্রিটিশ শাসকবর্গের প্রতি তাঁহার আস্থা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, তাই তিনি ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আপোস রফা ও সহযোগিতা করিতে গররাজী ছিলেন না। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই গান্ধীজীর মনোভাব পরিবর্তিত হইল, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি ভারতবাসীকে ব্রিটিশ

অমৃতসর কংগ্রেস

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইনের প্রতি গান্ধীজীর সমর্থন

* B. Prasad's *Changing modes of National Movement*, p. 89.

সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করিতে আহ্বান জানাইলেন। অনেকে মনে করেন, খিলাফৎ-এর প্রশ্নেই তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রাউলাট আইন-ই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জনক। কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রিটিশ সরকার 'খিলাফৎ'-এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ায় এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক ডায়ারের অপরাধকে লঘু করিয়া প্রদর্শন করায় গান্ধীজীর রাজানুগত্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়। এই দুইটি প্রশ্নেই গান্ধীজীর গভীর রাজভক্তি তীব্র রাজদ্রোহে রূপান্তরিত হয় এবং তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

খিলাফৎ আন্দোলন ঃ তুরস্কের সুলতানকে ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্মগুরু বা খলিফারূপে গণ্য করিতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সুলতান জার্মানি বা কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষ গ্রহণ করায় গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তি তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং যুদ্ধে তুরস্ক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির শর্তানুসারে মিত্রশক্তি তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থান গ্রাস করে। তুরস্কের সুলতানের এহেন দুর্গতির জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ গ্রেট ব্রিটেনকেই দায়ী করে। প্যারিসের শান্তি চুক্তিতে তুর্কী সুলতানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ আন্দোলন করিতে থাকে। এই আন্দোলনই খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য খিলাফৎ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি-দল ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং খলিফার মর্যাদা ও সম্মান যাহাতে প্যারিসের শান্তিচুক্তিতে রক্ষিত হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাঁহারা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। অতঃপর তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সম্পাদিত 'সেভ্রেসের চুক্তি' প্রকাশিত হইলে, দেখা গেল তুরস্কের সুলতান সাম্রাজ্য হারাইয়া কার্যত মিত্রপক্ষের নজরবন্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধির এই কঠোরতায় ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ মর্মাহত হইলেন, এবং ইহার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করিলেন। কিন্তু খলিফার প্রতি অনুষ্ঠিত অনাচার ও অমর্যাদার প্রতিকার তাঁহারা কিভাবে করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

তুরস্কের দুর্গতিতে ভারতীয় মুসলমান সমাজের অসন্তোষ

মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ মৌলভী ও মোল্লারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের হুমকী দিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই দুর্দিনে গান্ধীজী তাঁহাদের সহায় হইলেন, তাঁহাদের নূতন পথ দেখাইলেন। তিনি খিলাফৎ-এর প্রতিকারের জন্য, ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে অবতীর্ণ হইতে বলিলেন।

মাদ্রাজে খিলাফৎ সম্মেলনে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলন গান্ধীজীর প্রস্তাবিত অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করিল এবং হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে পয়লা আগস্ট দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগের প্রথম নিদর্শন হিসাবে গান্ধীজী ভারত সরকারের প্রদত্ত 'কাইসার-ই-হিন্দ্' পদক সরকারের নিকট ফেরত পাঠান। খিলাফৎ-নেতা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীর আহ্বানে ভারতের মুসলমান জনতা এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গান্ধীজী অতঃপর খিলাফৎ আন্দোলনকে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার ও স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সর্ব-ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করেন। কিন্তু তুর্কী সুলতানের মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের আরব্ধ আন্দোলন



মহম্মদ আলী

সমর্থন করিলে ভারতীয় মুসলমানদের বহিঃরাষ্ট্রীয় আনুগত্য বৃদ্ধি পাইবে এবং অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দুর্বল হইবে, তাহা গান্ধীজীর মত বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ কেন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সত্যাগ্রহ-সম্পর্কে গান্ধীজীর চিন্তাধারা : গান্ধীজী ভারতবর্ষের জাতীয়-আন্দোলনে দুইটি নূতন সংগ্রামী কৌশল প্রয়োগ করেন, কৌশল দুইটি নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রসূত। একটি কৌশলের নাম সত্যাগ্রহ, অন্যটি অহিংসা নামে পরিচিত।

অহিংস সত্যাগ্রহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

সত্যাগ্রহের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে আন্দোলনকারী বা স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রাম করিবে,

অহিংসার তাৎপর্য হইল এই যে, ঐ সংগ্রামে স্বেচ্ছাব্রতীরা শত্রুর বিরুদ্ধে কোন হিংসা করিবে না। শত্রু-কর্তৃক আহত হইলেও শত্রুকে আঘাত করিবে না। গান্ধীজী এই দুইটি কৌশলের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ব বা Passive Resistance Theory প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরিকল্পিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র হইল হরতাল বা কর্মবিরতি, যাহা আধুনিক শিল্পযুগের স্ট্রাইক বা ধর্মঘটের নামান্তর। তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে, ইহাই হইল প্রতিবাদের প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতের প্রতিবাদের হাতিয়ারকে আধুনিক কায়দায় ব্যবহার করার মধ্যেই গান্ধীজীর রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় নিহিত।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন : গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ নীতির আদর্শ ও কর্মপন্থা ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ঐ কর্মপন্থার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করিলেও, জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর সাফল্য-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আহূত কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রবীণ নেতাদের বিরোধিতা-সত্ত্বেও খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অনাচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগের কার্যক্রম সাধারণ সদস্যদের ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী

গান্ধীজী আন্দোলনের নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করেন। (১) সরকারী উপাধি বর্জন ও অবৈতনিক সরকারী পদে ইস্তফা দান; (২) দরবার, সরকারী লেভী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যোগদান হইতে বিরত থাকা; (৩) সরকারী শিক্ষালয় বর্জন ও জাতীয় শিক্ষালয় গঠন; (৪) সরকারী আদালত বর্জন ও তৎপরিবর্তে বিবাদ-মীমাংসার জন্য সালিশী গঠন; (৫) সামরিক বিভাগের কার্য-উপলক্ষে মেসোপটেমিয়ায় গমনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন; (৬) নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন বর্জন; (৭) বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কট বা বর্জন।

এই সকল কর্মসূচী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চরকায় সূতা কাটিয়া বস্ত্রবয়ন করিয়া গান্ধীজী স্বদেশী ব্রত পালনের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করিলেন।

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হইলেও সভাপতি লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রবীণ

সদস্যগণ ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কিন্তু পরবর্তী নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের জাদুকরী প্রভাবে চিত্তরঞ্জন দাশ স্বয়ং অসহযোগের প্রস্তাবটি ব্যাপকতর করিয়া উত্থাপন করিলেন এবং লাজপৎ রায় তাহা সমর্থন করেন। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের নূতন সংবিধান গ্রহণ করা হয়। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনেই গান্ধীজী সারা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন। সারা দেশ অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নূতন নেতাকে মহাত্মারূপে বরণ করিয়া লয়। এই সময় হইতে গান্ধীজী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে সূর্যের মত ভাস্বর হইয়া উঠিলেন। ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সূর্যের আলোতে ম্লান নক্ষত্রের মত লোকচক্ষুর অগোচরে চলিয়া গেলেন। নাগপুর অধিবেশন হইতে ইতিহাসে যে-যুগের সূত্রপাত তাহার নাম গান্ধীযুগ।

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃপদে গান্ধীজী

১৯২১ খ্রীস্টাব্দ হইতে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম নূতন রূপ গ্রহণ করিল। গান্ধীজীর জাদুমন্ত্রের স্পর্শে যেন ভারতীয় জনতা দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগিয়া উঠিল, গান্ধীজী ঘোষণা করিয়াছিলেন এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ আসিবে। দলে দলে যুবক, বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহরবাসী, পল্লীবাসী গান্ধীজীর ডাকে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল, ছাত্ররা সরকারী শিক্ষালয় পরিত্যাগ করিল, দোকানে দোকানে চলিল বিলাতী পণ্য বর্জনের জন্য পিকেটিং। অহরহ বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব চলিল, খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবী আর জাতীয় কংগ্রেসের সেবাব্রতীদের ব্রিটিশ-বিরোধী শ্লোগানে দেশ মাতিয়া উঠিল। নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনেকটা প্রহসনে পরিণত হইল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যোগ্য প্রার্থীর অভাব ঘটিল। আন্দোলনের শুরুতে মহম্মদ আলী, সৌকৎ আলী, আবুল কালাম আজাদ-প্রমুখ মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাকিম আজমল খান, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল নেহেরু, বিটলভাই প্যাটেল, রাজাগোপাল আচারী,

অসহযোগ আন্দোলনের জনপ্রিয়তা


হাকিম আজমল খান

পট্টভি সীতারামাইয়া, মহম্মদ আলী আন্সারী প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে শত শত নামহীন খ্যাতিহীন ছাত্র ও যুবক সর্বস্ব পণ করিয়া গান্ধীজীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গান্ধীজীর ডাকে বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ, এলাহাবাদের মতিলাল নেহেরু বিলাসময় জীবনধারা পরিত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রফুল্ল ঘোষ, সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় উচ্চপদের লোভ ও মোহ ত্যাগ করিয়া গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিলেন। মৃতপ্রায় দেশ নব প্রাণস্পন্দনে জাগিয়া উঠিল।



মহম্মদ আলী আন্সারী

আন্দোলনের দ্রুত বিস্তারে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ভারত-বাসীর মধ্যে রাজানুগত্যের ঐতিহ্য জাগাইবার জন্য ভারত সরকার গ্রেট-ব্রিটেনের যুবরাজকে ('প্রিন্স অফ ওয়েলস্') অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। কিন্তু ভারতবাসী যুবরাজকে অভ্যর্থনার বদলে সর্বত্র বয়কট করিল। ভারত সরকার এই সঙ্কটে মধ্যপন্থী বা নরমপন্থীদের মধ্যস্থতায় গান্ধীজীর সঙ্গে আপোস রফার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, আন্দোলন ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার বিশ হাজার ভারত-বাসীকে কারারুদ্ধ করিলেন, মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর সকল নেতাই বন্দী হইলেন।

ব্রিটিশ যুবরাজের ভারতে আগমন

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আমেদাবাদে আহূত কংগ্রেসে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গান্ধীজীকে সর্বাধিনায়ক করা হইল। দেশের বিভিন্ন স্থানে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলিল, এক বছর সময় অতিক্রান্ত, কিন্তু স্বরাজ তখনও আসে নাই, জনতা তাই অসহিষ্ণু, ব্রিটিশ শাসকদের উপর শেষ আঘাত হানিবার জন্য উদ্গ্রীব, কিন্তু গান্ধীজী রাশ টানিয়া আন্দোলনকে সংযত করিতে চাহিলেন, সকলকে ধৈর্য ধরিতে বলিলেন। তিনি তাঁহার পরিকল্পনা-অনুযায়ী আন্দোলন চালাইতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, ঐ আন্দোলনে হিংসার কোন স্থান নাই। এই সময়ে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি গোরক্ষপুর

আমেদাবাদে কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালনার একক নেতৃত্বে গান্ধীজী

জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে পুলিশের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করিল, ইহার ফলে একজন দারোগা ও কয়েকজন কনস্টেবল মারা গেল। সংবাদ পাইয়া মহাত্মা গান্ধী অহিংসাভ্রষ্ট অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখিলেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনকে 'হিমালয়প্রমাণ ভুল' বলিয়া অভিহিত করিলেন।) গান্ধীজীর এই আকস্মিক কার্যে সমস্ত দেশে হতাশা নামিয়া আসিল, তিনি সকলের সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাইল। সরকার সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিচারে তাঁহার ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হইল।

চৌরীচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনা

আন্দোলন প্রত্যাহার

গান্ধীজীর কারাবরণ

স্বরাজ্য দল : অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় দেশের রাজনীতি অচিরেই ভিন্নপথাশ্রয়ী হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ যে-তুর্কী খলিফাকে স্বপদে বহাল রাখার জন্য খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করিয়াছিল, সেই তুর্কী খলিফাকে তুরস্কের মুসলমান প্রজারা মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে দেশ হইতে বিতাড়িত করায় ভারতবর্ষে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায়। জাতীয় আন্দোলন হইতে গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লা ও মৌলভীরা সরিয়া যায়; হিন্দুদের সঙ্গে যৌথভাবে চলার প্রয়োজন শেষ হওয়ায় বহু স্থানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়।

খিলাফৎ আন্দোলনের বিরতির কারণ

কংগ্রেসের শক্তিশালী নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিটলভাই প্যাটেল, মতিলাল নেহেরু, গান্ধীজীর বিদেশী বস্ত্র, আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ, উপাধি ও আইনসভা বর্জন—এই পঞ্চবিধ বয়কট নীতিকে কোনদিনই মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখায় তাঁহারা মনে করিলেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রবেশ করিয়া সরকারী কার্যে বাধা প্রদান করাই বিধেয়। আইনসভায়

চিত্তরঞ্জন দাশের আইনসভায় প্রবেশের পরিকল্পনা



চিত্তরঞ্জন দাশ

প্রবেশের মূল উদ্দেশ্য হইবে নব-প্রবর্তিত সংস্কার আইনের সীমাবদ্ধতা ও আমলাতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশ করা। এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক হইলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। গয়া কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের উদ্ভাবিত পরিকল্পনা বাতিল হইয়া গেল। গান্ধীজীর গোঁড়া সমর্থকবৃন্দ আইনসভায় প্রবেশের প্রস্তাব ভোটের জোরে বানচাল করিয়া দিলেন। ইহার ফলে কংগ্রেসে মতবিরোধ তীব্রভাবে দেখা দিল। যাঁহারা আইনসভায় প্রবেশের পক্ষপাতী তাঁহারা প্রো-চেঞ্জার বা পরিবর্তনবাদী ও যাঁহারা তথায় প্রবেশের বিরোধী ও গান্ধীজীর পঞ্চবিধ বয়কট নীতির পক্ষপাতী তাঁহারা নো-চেঞ্জার বা পরিবর্তন-বিরোধী নামে পরিচিত হইলেন। পরিবর্তন-বাদীদের লইয়া চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য দল নামে একটি দল গঠন করিলেন। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধি-বেশনে স্বরাজ্যপন্থীরা তাহাদের অনুকূলে প্রস্তাব পাশ করাইয়া লয় এবং আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বাংলাদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা-কল্পে বাংলাদেশে মুসলিম সদস্যদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া তাহাদের কতকগুলি সুবিধা প্রদান করেন। দিল্লী কংগ্রেসের পরে কোকনদ কংগ্রেসে স্বরাজ্যপন্থীরা তাঁহাদের অনুকূলে কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করায় গোঁড়া গান্ধীবাদী বা পরিবর্তন-বিরোধীরা তীব্র আপত্তি জানায় এবং কংগ্রেস দ্বিধা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী কারামুক্ত হন এবং ঐ বৎসর বেলগাঁওয়ে আহূত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে তিনি দ্বিমুখী একটি কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। ঐ দ্বিমুখী কর্মসূচীতে স্থির হয় যে, স্বরাজ্যপন্থীরা বা পরিবর্তনবাদীরা আইনসভায় তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্মসূচী

প্রো-চেঞ্জার নো-চেঞ্জার

স্বরাজ্য দল গঠন ও গান্ধীপন্থীর সঙ্গে বিরোধ



মতিলাল নেহরু

বেলগাঁও কংগ্রেস ও গান্ধীজীর দ্বিমুখী কর্মসূচী

গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু আইনসভার বাহিরে তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচী অনুসরণ করিতে হইবে। এই অধিবেশনেই স্বরাজ্য দলকে কংগ্রেসের অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

স্বরাজ্য দল আইনসভায় উত্তেজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া দেশবাসীকে কিছুদিন উৎসাহিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু শীঘ্রই মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় স্বরাজ্য দল দুর্বল হইয়া পড়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে স্বরাজ্য দল তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নেতাকে হারাইলেন। স্বরাজ্যপন্থীদের অপর কোন নেতা আভ্যন্তরীণ বিরোধ দূর করিতে পারিলেন না। স্বরাজ্য দলের একশ্রেণীর সদস্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এমন কি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতেও রাজী হইলেন। ইহার ফলে স্বরাজ্য দল দুইভাগে বিভক্ত হইল। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রধান প্রধান স্বরাজ্যপন্থী নেতারা আইনসভা পরিত্যাগ করিলেন; মধ্যরাত্রের অন্ধকার যেন স্বরাজ্য দল তথা কংগ্রেসকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু

স্বরাজ্য দলে বিভেদ

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পুনরাবির্ভাব: অহিংস গণআন্দোলন আকস্মিক ভাবে স্থগিত রাখার ফলে দেশব্যাপী হতাশা ও অবসাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের যুবকগণ তাহারই প্রতিক্রিয়ায় পুনরায় ষড়্‌যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার পথ ধরিলেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে গোপীনাথ সাহা কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া ভ্রমবশত জনৈক নিরীহ ইংরেজকে খুন করিলেন। বিচারে গোপীনাথ সাহা ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন।

গোপীনাথ সাহার ফাঁসী

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ হইতেই পুলিশ ও সরকারী গুপ্তচর বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে হত্যার জন্য বিপ্লবীরা নানাভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রমোদ চৌধুরী নামক জনৈক বিপ্লবী একজন উচ্চপদস্থ জেল তত্ত্বাবধায়ককে দুঃসাহসিকভাবে হত্যা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বিপ্লবী প্রমোদ চৌধুরী

কাকোরী ষড়্‌যন্ত্র মামলা

এই সময়ে উত্তরপ্রদেশেও বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা শুরু হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের সরকার কাকোরী ষড়্‌যন্ত্র মামলা দায়ের করিয়া রামপ্রসাদ, রোশনলাল, আসফাকউল্লা-

প্রমুখ চার জন বিপ্লবীর ফাঁসি দেয়, অন্যান্য বিচারাধীন বন্দীকে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ড দেয়।

ভগৎ সিংহ

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে লাহোরের সহকারী পুলিশ সুপারিটেন্টেণ্ড মিঃ সনডার্সকে ভগৎ সিং হত্যা করিয়া কৌশলে পলায়ন করেন। অতঃপর ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদের সভাকক্ষে দুইটি বোমা নিক্ষেপ করিয়া স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দেন। এই ঘটনার পরে লাহোরে বোমা তৈয়ারীর একটি বিরাট কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করে এবং এই সূত্রে বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন বন্দীদের দীর্ঘ অনশন ধর্মঘট সারা ভারতে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ধর্মঘটের সময় ৬৪ দিন অনশনে থাকিয়া যতীন দাস শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলায় সুকদেব, রাজগুরু ও ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়। অন্যান্য বিচারাধীন বন্দীরা হয় দ্বীপান্তরিত, না হয় দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইনের ট্রেনের কামরায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়, যদিও বড়লাটের কোন



ভগৎ সিং

যতীন দাসের অনশন ও মৃত্যু

লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা



যতীন দাস



সূর্য সেন

ক্ষতি হয় নাই। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন সেই সময়ে বাংলাদেশে মাস্টার দা বা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে এত বড় দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক অভিযান বাংলাদেশে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিপ্লবীদের কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেন, অনেকে বন্দী হন, বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সূর্য সেন

প্রশ্নাবলী

১। হোমরুল আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

২। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কর।

৩। রাউলাট আইন কি? এই আইন প্রত্যাহারের জন্য গান্ধীজী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন? ইহার ফলে ভারতে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়?

৪। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

৫। অহিংসা ও সত্যাগ্রহ সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৬। খিলাফৎ কি? খিলাফৎ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হইল কিভাবে?

৭। গান্ধীজী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কি কি কারণে অহিংস সত্যাগ্রহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

৮। স্বরাজ্য দল সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৯। গান্ধীজী কিভাবে ও কখন ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন?

১০। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন কেন স্থগিত রাখেন? অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার ফলে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল?

১১। টীকা লিখ : জালিয়ানওয়ালাবাগ, ডায়ার্কি, চৌরীচৌরা, প্রোচেঞ্জার, নোচেঞ্জার।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মুক্তি আন্দোলনের নূতন অধ্যায়

সাইমন কমিশন ঃ অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় সারা ভারতে যে-গভীর হতাশা, বিষাদ ও নৈরাশ্য নামিয়া আসিয়াছিল ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক একটি ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে (মন্ট-ফোর্ড সংস্কার কতটা কার্যকর হইয়াছে তাহা তদন্ত করিবার জন্য) সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাইমন কমিশন ভারতে আসিবে ইহাতে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সাইমন কমিশন যে-ভাবে গঠিত হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে ভারতবাসীর প্রবল আপত্তি ছিল।

শুধু শ্বেতাঙ্গ সদস্য সমন্বিত কমিশন

কমিশনটি শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, উহাতে ভারতীয় কোন প্রতিনিধির স্থান হয় নাই। ভারতবাসী ভাবিল, তাহাদের দেশে কি ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে, সে কথা ভারতবর্ষের কেহ বলিতে পারিবে না। তাহা বিচার করিবে ইংরেজ! এই অপমানে ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভারত-বাসীর আত্মমর্যাদা প্রচণ্ডভাবে আহত হইল। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে যুবক জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবসহ সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। মুসলিম লীগের একাংশ ব্যতীত ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলও সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত

ইহার ফলে দ্বন্দ্ব-কলহ-দাঙ্গায় ম্রিয়মাণ ভারতবর্ষ প্রচণ্ড আলোড়ন ও প্রবল বিক্ষোভে পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল এবং ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন এক নূতন পর্যায়ে উন্নীত হইল।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিলেন। ভারতবর্ষে কমিশন সর্বত্র হরতাল আর বিক্ষোভের সম্মুখীন হইলেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর এই স্পর্ধা দমন করার জন্য জনতার উপর নিপীড়ন আরম্ভ কারলেন। পুলিশের আক্রমণে বিক্ষোভকারীদের অনেকে গুরুতরভাবে আহত হইলেন।

বোম্বাইয়ে হরতাল

লাহোরে বিক্ষোভমিছিল পরিচালনা করিতে গিয়া সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপৎ রায় গুরুতরভাবে আহত হইলেন। পরে তিনি মারা যান। সাইমন কমিশন এইভাবে বিক্ষোভকারীদের রক্তস্নাত পথে পদচারণা করিয়া শেষপর্যন্ত ভারতে তাঁহাদের অনুসন্ধানের কাজ শেষ করেন।

পুলিশ প্রহারে লাজপৎ রায়ের জীবনাবসান

ইতিমধ্যে মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাব-অনুসারে ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির উপর ডোমিনিয়ান স্টেটাস্ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে একটি সংবিধান রচনার ভার ন্যস্ত হয়। নেহেরু কমিটির রিপোর্ট ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসের সর্বদলীয় সম্মেলনে পেশ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ শুরু হয়। রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আক্রমণ করেন মতিলাল নেহেরুর পুত্র তরুণ জওহরলাল নেহেরু এবং বাংলাদেশের তরুণদের উদীয়মান নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। এই তরুণ নেতারা উপনিবেশ মার্কা স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে রচিত গঠনতন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে সংবিধান রচনার দাবি জানান। রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তাহার বিরোধিতা করে। গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্মানজনক আপোসের দলিলরূপেই নেহেরু রিপোর্টকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর বিরোধিতা-সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে রচিত এই সংবিধান ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে আহূত কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রচণ্ড চাপে ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। গঠনতন্ত্রটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রস্তাব ও দলের তরুণদের সন্তুষ্ট করার জন্য গৃহীত হয় এবং ঐ প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯২৯


বিজয় রাঘব আচার্য

নেহেরু রিপোর্ট

জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষ বসুর নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা

কলিকাতা কংগ্রেসে নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত

সরকারের বিরুদ্ধে আইন-অমান্যের হুমকী

খ্রীস্টাব্দে ৩১-এ ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি নেহেরু সংবিধান পুরাপুরি গ্রহণ না করেন তবে কংগ্রেস ঐ তারিখের পরে দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানাইবে।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিক দল রামসে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ইতিপূর্বে কমন্স সভায় বিরোধী দলের নেতা রূপে তিনি ভারতবাসীর রাজনৈতিক দাবি সম্পর্কে অনেকবার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে ভারত-বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপেও একবার তাঁহার নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু পত্নী-বিয়োগের জন্য তিনি সেই সময়ে ভারতে আসিতে পারেন নাই। এহেন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে সুব্যবহার পাওয়ার আশা জাগ্রত হইল। রামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতের শাসন-বিষয়ক প্রশ্ন আলোচনার জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড আরউইনকে ইংল্যাণ্ডে ডাকিয়া পাঠান।

বিলাতে শ্রমিক দলের ক্ষমতালাভ

ইংল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লর্ড আরউইন দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শাসনের আদর্শ হইল ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ বা স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবর্গকে লণ্ডনে একটি বৈঠকে আহ্বান করা হইবে। এই ঘোষণায় ব্রিটিশ শাসকবর্গ-সম্পর্কে হৃত বিশ্বাস ও আস্থা পুনরায় ভারতীয় নেতৃবর্গের মনে জাগ্রত হইল। গান্ধী-প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সরল বিশ্বাসে ভাবিলেন যে, ভারত সরকার তাঁহাদের চরমপত্রের কথা স্মরণে রাখিয়াই ৩১-এ ডিসেম্বরের পূর্বে ভারতবর্ষের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করিতে রাজী হইয়াছেন।

লর্ড আরউইনের ঘোষণা

দিল্লীতে উপস্থিত বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ একটি বিবৃতিতে বড়লাট আরউইনকে এই ঘোষণার জন্য সাধুবাদ জানাইলেন এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে তাঁহারা আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করিলেন। লর্ড আরউইনের বিবৃতির ফলে ইংল্যাণ্ডে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইল। টোরি ও লিবারেল দলের সদস্যগণ শ্রমিক-সরকারের ভারত-সম্পর্কিত নীতিকে তীব্র আক্রমণ করিলেন এবং ইহার প্রতিক্রিয়ায় (ইংল্যাণ্ডের) ভারত-সচিব ওয়েজউড বেন বলিলেন যে, ব্রিটিশ

বড়লাট আরউইনের ঘোষণায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সন্তোষ

সরকারের ভারত শাসননীতি বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয় নাই ; পার্লামেন্টের সম্মতি-ব্যতিরেকে ভারত-সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না। লর্ড আর-উইনের বিবৃতিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যতটা উৎফুল্ল হইয়াছিলেন ভারত সচিব ওয়েজউড বেনের বিবৃতিতে ততোধিক হতাশ হইলেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী, মতিলাল নেহেরু ও আরো কয়েকজন ভারতীয় নেতা বড়লাট আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে চাহিলেন প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন-সম্পর্কে কোন আলোচনা হইবে কি না। কিন্তু এই বিষয়ে বড়লাট স্পষ্টভাবে কিছু বলিতে অস্বীকার করায় গান্ধীজী ও মতিলাল নেহেরু রিক্ত হাতেই কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোস রফার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল ; পূর্বঘোষিত ব্যবস্থা-অনুযায়ী আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে গত্যন্তর রহিল না।



শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

বড়লাট আরউইনের গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনার বিষয় সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপনে অক্ষমতা

লাহোর কংগ্রেস ঃ লোকচরিত্র- ও দেশের নাড়ী-সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল গান্ধীজীর। সর্বদলীয় সম্মেলন ও কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি লক্ষ করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের তরুণ সদস্যগণ অসহিষ্ণু। তাঁহারা তাঁহার নির্দেশ পালনে অনিচ্ছুক। তরুণ সম্প্রদায় জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক। কিন্তু আসন্ন সংগ্রামে নবীন-প্রবীণ, ছাত্র-যুবক সকলকে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হইবে এবং আসন্ন সংগ্রামে যুবক সম্প্রদায়কেই অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ ও ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। তাই গান্ধীজী যুবকশ্রেণীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য দশটি প্রদেশ-কর্তৃক নিজে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইয়াও ঐ পদে তরুণ সম্প্রদায়ের অন্যতম নায়ক জওহরলাল নেহেরুকেই মনোনীত করিলেন। কৌশলে গান্ধীজী জওহরলালের স্কন্ধে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া

গান্ধীজী-কর্তৃক জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত

একদিকে যেমন তাঁহার আবেগের আতিশয্য সংযত করিলেন, অন্যদিকে তাঁহাকে তিনি চিরদিনের জন্য নিজের অনুবর্তী করিয়া লইলেন।

জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি ঃ কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। সভাপতির ভাষণে জওহরলাল ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করিলেন। এই সভায় স্থির হইল যে, কংগ্রেস আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক লক্ষ্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নয়, ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। সুতরাং এই অধিবেশনে মতিলাল নেহেরুর রিপোর্ট বা সংবিধান বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইল। পূর্ববৎসরের ঘোষণা মত ৩১-এ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কংগ্রেসের সদস্যগণ স্বাধীনতার শপথ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিলেন। অতঃপর ২৬-এ জানুয়ারি প্রতি বৎসর 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। আসন্ন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণকে পদ-ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হইল এবং আইন অমান্য ও কর বা খাজনা বন্ধ আন্দোলন করার দায়িত্ব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইল।

লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত



জওহরলাল নেহেরু

২৬-এ জানুয়ারির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ পূর্ব ব্যবস্থা-অনুযায়ী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ জানুয়ারি ভারতের সর্বত্র 'স্বাধীনতা দিবস'-রূপে প্রতিপালিত হইল, ঐদিন শহরে ও গ্রামে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিয়া বিশেষভাবে রচিত একটি শপথ-মন্ত্র পাঠ করা হইল। ঐ শপথমন্ত্রে ঘোষণা করা হইল যে, পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য, ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। কোন সরকার ভারতবাসীকে এই জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে

২৬-এ জানুয়ারির সঙ্কল্প মন্ত্র

পারে না। যেহেতু ইংরেজগণ ভারতবাসীকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, সেইজন্য ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সহিত সকল প্রকার বন্ধন ও সংস্রব ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ হইতে প্রতি বৎসর সারা ভারতে ২৬-এ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস'-রূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে এই দিনটিতে গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পর হইতে এই দিনটি 'প্রজাতন্ত্র' দিবস রূপে পরিচিত। ২৬-এ জানুয়ারির সঙ্কল্প বাক্যের মাধ্যমে ভারতবাসী স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করে। ভারতবাসীর দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা ঐ সঙ্কল্প বাক্যের মধ্যেই প্রথম উচ্চারিত হয়। গান্ধীজী মনে করিতেন, স্বাধীনতা নবজন্মের সমতুল্য। সকল জন্মই যেমন মুহূর্তের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে, ভারতবর্ষের নবজন্মও ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ জানুয়ারির সেই পরম লগ্নেই ঘটিয়াছিল। গান্ধীজী জানিতেন চরম দুঃখ বরণ- ও আত্মত্যাগ-ব্যতীত কোন দেশ, কোন জাতি কোনদিন স্বাধীন হইতে পারে নাই। জাতির নবজন্মের পরম লগ্ন হইতে তাঁহাকে পুরাতন প্রভু ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। দেশ ও জাতির ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব তাই তিনি নিজ স্কন্ধে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন।

২৬-এ জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস

আইন অমান্য আন্দোলন : গান্ধীজী আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্বে এগার দফা দাবি-সংবলিত এক দীর্ঘ চিঠি বড়লাট লর্ড আরউইনের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ এগার দফা দাবির মধ্যে লবণ-কর রহিতকরণের ও বন্দী-মুক্তির প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু বড়লাটের নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইয়া গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ সবরমতী আশ্রমের ৭৮ জন কর্মী-সহ পদব্রজে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য বোম্বাই প্রদেশের দণ্ডী-নামক সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানে যাত্রা করিলেন। তৎকালে লবণের ব্যবসা ছিল ব্রিটিশ সরকারের একচেটিয়া অধিকারে এবং লবণ উৎপাদন ভারতবাসীর পক্ষে দণ্ডনীয় ছিল। বিপুল মুনাফা আসিত লবণের ব্যবসা হইতে। লবণ নিত্য ব্যবহার্য বস্তু। ধনী, দরিদ্র সকলেই

সরকারের নিকট এগার দফা দাবি পেশ

গান্ধীজীর দণ্ডী অভিযান

লবণ ব্যবহার করেন। সুতরাং গান্ধীজী-পরিচালিত লবণ সত্যাগ্রহে ভারতের জনতা বিপুলভাবে সাড়া দিল। গান্ধীজী সবরমতী হইতে দণ্ডী যাওয়ার সুদীর্ঘ পথে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা প্রচার করিতে করিতে চলিলেন এবং পথিপার্শ্বে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ সহস্র সহস্র গ্রামবাসী দ্বারা সংবর্ধিত হইলেন। দাবাগ্নির মত লবণ সত্যাগ্রহের বার্তা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে ৫ই এপ্রিল তিনি দণ্ডীতে আসিয়া পৌঁছাইলেন। ঐ দিনই প্রাতঃকালীন উপাসনার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে লবণ প্রস্তুত করিয়া তিনি ব্রিটিশ সরকারের আইন ভঙ্গ করিলেন।

গান্ধীজী-কর্তৃক লবণ আইন ভঙ্গ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি স্মরণে রাখিয়া ৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল এই সাত দিন সারা ভারতে জাতীয় সপ্তাহরূপে পালনের আদেশ দিলেন এবং জাতীয় সপ্তাহে দেশের সর্বত্র লবণ আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত করা হইল। জাতীয় কংগ্রেসের হিসাবমত অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ স্থানে ঐ সময়ে লবণ আইন ভঙ্গ করা হইয়াছিল। লবণ সত্যাগ্রহের সংবাদ বিদেশে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। কোন কোন মার্কিন সাংবাদিক লবণ সত্যাগ্রহকে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের 'বোস্টন টি পার্টি'র সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী অতঃপর ধরশনার লবণের গোলা আক্রমণের পরিকল্পনা করিলেন। কিন্তু ধরশনা অভিযানের পূর্বরাত্রে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইল। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র হরতাল পালিত হইল। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়াও ধরশনা অভিযান বন্ধ করা গেল না। গান্ধীজীর শিষ্য আব্বাস তায়েবজী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বরেণ্য দেশসেবক, দেশসেবিকাদের অধিনায়কত্বে শত শত লবণ সত্যাগ্রহী ধরশনা জয়ে অগ্রসর হন। পুলিশের লাঠির আঘাতে বহু স্বেচ্ছাসেবী গুরুতরভাবে আহত হইলেন। কেহ কেহ মৃত্যুবরণও করিলেন।

ধরশনার লবণের গোলা আক্রমণ



সরোজিনী নাইডু

ধরশনায় অহিংস সত্যাগ্রহীদের নির্ভীক দুঃখবরণের কাহিনী সারা দেশে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিল।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িল। বিলাতী পণ্য বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, সরকারী অফিসে পিকেটিং প্রভৃতি বিচিত্র পদ্ধতিতে আইন অমান্য চলিতে লাগিল। মেয়েরা জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে দলে দলে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারা পর্দার আবরণ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষদের পাশে দাঁড়াইলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে এক সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া গেল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধপ্রবণ পাঠানদের দ্বারা গঠিত লালকুর্তা বাহিনী সহ খান্ আব্দুল গফ্ফর খান আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বাংলায় মেদিনীপুরে ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে চাষীদের অভ্যুত্থান ঘটিল। বোম্বাইয়ের 'শোলাপুরে' কারখানার শ্রমিকগণ ধর্মঘট শুরু করিল। শ্রমিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশে সরকার শোলাপুরে সামরিক আইন জারী করিয়া কয়েকবার গুলিবর্ষণ করিল। আন্দোলনের তীব্রতায় সন্ত্রস্ত সরকার নির্মম দমননীতি অনুসরণ করিতে ইতস্তত করিলেন না, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী সংগঠন বলিয়া ঘোষিত হইল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কারারুদ্ধ হইলেন। লক্ষাধিক সত্যাগ্রহীকে কারান্তরালে প্রেরণ করা হইল। বিক্ষোভকারীদের বিপুলপরিমাণ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল, পুলিশের আক্রমণে অসংখ্য লোক আহত, পঙ্গু অথবা নিহত হইলেন। এত অত্যাচারেও কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতা-স্পৃহা অনির্বাণ রহিল।

আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতা

লালকুর্তা বাহিনী

শোলাপুর ধর্মঘট

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী ঘোষণা

লুই ফিসার এই আন্দোলন-সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সেনারা ভারতবাসীকে লাঠি ও রাইফেলের আঘাতে জর্জরিত করিয়াছে। ভারতবাসী তাই বলিয়া ব্রিটিশের নিকট মাথা নত করে নাই, বিন্দুমাত্র অভিযোগ করে নাই, অথবা কাপুরুষের মত প্রাণভয়ে পলায়ন করে নাই। ইহার ফলেই ইংল্যাণ্ড শক্তিহীন এবং ভারতবর্ষ অজেয় হইয়া উঠিয়াছে।

সাংবাদিক লুই ফিসারের মন্তব্য

ব্রিটিশ সরকারের দমন ও তোষণ নীতি ঃ ব্রিটিশ সরকার ভারত-

বর্ষের মুক্তি-আন্দোলন দমন করার জন্য প্রয়োজন-অনুযায়ী পীড়ন, ভেদ ও তোষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতবাসীকে দমনের জন্য ইতিপূর্বে তাহারা যেমন রাউলাট আইন প্রণয়ন করিয়াছে, তেমনি তোষণের জন্য ভারত-সংস্কার আইনও প্রবর্তন করিয়াছে। লবণ সত্যাগ্রহ বন্ধ করার জন্য সরকার প্রথমত দমননীতি অবলম্বন করেন। কংগ্রেসের ছোটবড় সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া, বিক্ষোভকারীদের উপর নির্মম আক্রমণ করিয়া, জনসভা, মিছিল, পিকেটিং নিষিদ্ধ করিয়া সরকার ভাবিয়াছিলেন আইন অমান্য আন্দোলন স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত ফলই ফলিল। বিদ্রোহের আগুন সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। দমননীতি ব্যর্থ হওয়ায় সরকার ভেদনীতি অবলম্বন করিলেন। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ যাহাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতিদের পন্থা অনুসরণ না করে, তজ্জন্য সরকার পক্ষ হইতে আইন অমান্য আন্দোলনকে 'হিন্দু পরিচালিত আন্দোলন' নামে প্রচার করা হইল এবং এই আন্দোলনে যাহাতে মুসলমানগণ যোগদান না করেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইল। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইয়াও আন্দোলনের গতিবেগ মন্দীভূত করা গেল না। লবণ সত্যাগ্রহে প্রায় ১২০০০ (বারো হাজার) মুসলমান কারাবরণ করিলেন। তখন ব্রিটিশ সরকার গত্যন্তর না দেখিয়া তোষণ নীতি অবলম্বন করিলেন। যে-হিংস্র নখরাঘাতে ভারত সরকার স্বাধীনতাকামীদের এতদিন আহত করিয়াছেন, সেই নখর ভেলভেটের দস্তানায় আবৃত করিয়া করমর্দনের জন্য তাঁহাদের নিকট প্রসারিত করিলেন।

একদিকে বঙ্গভঙ্গ করিয়াছে অন্যদিকে মর্লি-মিন্টো আইন পাশ করিয়াছে

আন্দোলন দমনের জন্য ভেদনীতির আশ্রয়

ইতিপূর্বে গোল টেবিল বৈঠক-সম্পর্কে যে-আলোচনা চলিতেছিল, ব্রিটিশ সরকার সেই গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের তারিখ নির্দিষ্ট করিলেন ১২ নভেম্বর (১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ)। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস-ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গোল টেবিলে বসিতে সম্মত হইলেন। কংগ্রেসের উপস্থিতি-ব্যতীত ভারতের কোন সমস্যার সমাধান-যে সম্ভব নয়, তাহা ইংল্যাণ্ডের শাসকবর্গ জানিতেন। সুতরাং গান্ধীজী অথবা কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ

আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাসের জন্য তোষণ-নীতি অবলম্বন

যাহাতে গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তাহার জন্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার চেষ্টা করিতে থাকেন। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের দুই সপ্তাহের মধ্যে জর্জ স্লোকম্ব নামক জনৈক ইংরেজ সাংবাদিক জেলখানায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কি কি শর্তে সরকারের সঙ্গে আপোস করিতে পারেন তাহা জানিতে চাহেন। পরে মডারেট নেতা তেজবাহাদুর সাপ্রু ও জয়াকরও একই উদ্দেশে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মতিলাল ও জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া গান্ধীজী জানাইলেন যে, অনতিবিলম্বে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের শর্তে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোস-নিষ্পত্তি করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রস্তাব ব্রিটিশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আপোস-নিষ্পত্তির প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে স্লোকম্বের সাক্ষাৎকার

গোল টেবিল বৈঠক ঃ পরবর্তী কয়েক মাসে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই অবস্থায় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে মহা আড়ম্বরে ইংল্যাণ্ডে গোল টেবিলের প্রথম বৈঠক বসিল। ভারতীয় রাজন্যদের ১৬ জন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৫৬ জন ও বিলাতের ১৩ জন প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোনীত ও কংগ্রেস-বিরোধী। এই সকল প্রতিনিধি ভারতীয় জনতার নেতৃত্ব দাবি-যে করিতে পারেন না তাহা সকলের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল, ফলে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক মন্ত্রিসভা আরও সহজ শর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোস-রফা করিতে রাজী হইলেন।

প্রথম গোল টেবিল বৈঠক

প্রথম আপোস-নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার আপোস-নিষ্পত্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আগ্রহান্বিত হওয়ার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত, আইন অমান্য আন্দোলনের পরিধি সরকারী নির্যাতন-সত্ত্বেও দিনের পর দিন বিস্তার লাভ করিতেছিল। শোলাপুর ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যত্র জনতা সশস্ত্র পন্থা গ্রহণ করে নাই। ভারতের অধিকাংশ স্থানে সত্যাগ্রহীরা পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনীর আক্রমণে আহত হইয়াছেন, রক্তাপ্লুত অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। সত্যাগ্রহীদের

কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আপোসের কারণ

নীরব আত্মত্যাগ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর বিবেককেও পীড়িত করে। পেশোয়ারে 'রয়াল গাড়োয়াল রাইফেলস'-এর সৈনিকরা নিরস্ত্র পাঠানদের উপর গুলিবর্ষণের আদেশ অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অনেক স্থানে অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী নিরস্ত্র ও নিরীহ শোভাযাত্রীদের অশ্বখুরে পদদলিত করার নির্দেশ অমান্য করে। সরকারের অধীন শান্তি-রক্ষকদের সত্যাগ্রহীদের প্রতি সমবেদনায় সরকার বিব্রত বোধ করেন।

লবণ আইন ভঙ্গ, মদের দোকানে পিকেটিং, এবং খাজনা বন্ধ করার ফলে রাজস্বখাতে সরকারী আয় অস্বাভাবিক হ্রাস পায়। বিলাতী কাপড় বর্জনের ফলে ইংল্যাণ্ডে মিলমালিকদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে। আর্থিক ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্ষতি-ব্যতীত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মিশনারী, ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আবেদনে এবং প্রতিকূল বিশ্বজনমতের প্রতিক্রিয়ায় ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ভাষণে একদিকে যেমন ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা-সম্বন্ধে তাঁহার আপোস ও গঠনমূলক অভিমত ব্যক্ত করেন অন্যদিকে তিনি এই আশাও প্রকাশ করেন যে, পরবর্তী বৈঠকে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইবেন না।

ইংল্যাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য গান্ধীজীর নিকট আবেদন করিলেন এবং সরকারের সদিচ্ছার নিদর্শন হিসাবে গান্ধীজীসহ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের কারামুক্ত করেন। ইংল্যাণ্ডের গোল টেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাগত তেজবাহাদুর সাপ্রু, জয়াকর ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মধ্যস্থতায় গান্ধীজী ও আরউইনের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইল এবং কয়েকদিনব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনার পরে গান্ধীজী ও আরউইনের মধ্যে একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইল, এই চুক্তিই গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তির শর্তানুসারে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইল। হত্যা প্রভৃতি অপরাধ-মূলক কার্যে অভিযুক্ত ব্যতিরেকে সমস্ত রাজবন্দী মুক্ত হইলেন। ভারতের ভাবী সংবিধানের রূপরেখার অস্পষ্ট একটি চিত্র সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গেল, করবন্ধ আন্দোলন স্থগিত রহিল কিন্তু সমুদ্র-উপকূলের অধিবাসীরা লবণ প্রস্তুতের অধিকার পাইল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি

চুক্তিটি জাতীয় কংগ্রেসের অনেক নেতার তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া

দাঁড়ায়। বন্দী-মুক্তির শর্তটি সম্পর্কে অনেকের তীব্র আপত্তি ছিল, কারণ ঐ শর্তে সন্ত্রাস-মূলক কার্যে অভিযুক্তদের মুক্তির ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষত ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড মকুব না হওয়ায় তরুণদের বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র এই চুক্তির জন্য খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এত বিরোধিতা-সত্ত্বেও পরবর্তী করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে চুক্তিটি ভোটাধিক্যে সমর্থিত হয় এবং গান্ধীজীকে জাতীয় কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি-রূপে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

চুক্তির বিরুদ্ধে তরুণদের বিক্ষোভ

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ১০৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অধিকাংশ প্রতিনিধি নিজ নিজ ধর্মসম্প্রদায়, শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থ-চিন্তা ব্যতীত সর্বভারতীয় জাতীয় স্বার্থের কথা একবারও উচ্চারণ করেন নাই। মুসলিম ও শিখ প্রতিনিধিগণ সর্ব বিষয়ে তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য সোচ্চার হইয়া উঠেন। গান্ধীজীর অনুরোধ-সত্ত্বেও তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বর্জন করিয়া জাতীয় স্বার্থে একমত হইয়া শাসন-সংস্কারের দাবি সম্মেলনে পেশ করেন নাই। বরং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠের চুক্তি নামে এক চুক্তি করিয়া বসিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের কৌশলে কোণঠাসা হইয়া পড়িলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বায়ত্তশাসন-সম্পর্কিত মূল দাবিটিকে এড়াইয়া সংখ্যালঘু সমস্যাকে আয়তনের তুলনায় বড় করিয়া দেখিলেন। রিক্ত হস্তে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ধূর্ত ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা তাঁহার সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও সাধুসুলভ ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য দিল না। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিলম্বে হইলেও উপলব্ধি করিলেন যে, একটি মাত্র ব্যক্তিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি-রূপে গোল টেবিল বৈঠকে প্রেরণ করা বুদ্ধির কাজ হয় নাই।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ভিত্তিটি প্রথম হইতে ছিল দুর্বল ও ভঙ্গুর। চুক্তি স্বাক্ষরের অনতিকাল পরেই ব্রিটিশ আমলাদের মধ্যে চুক্তিভঙ্গের প্রবণতা দেখা যায়। গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইলে কংগ্রেস-যে পুনরায় আন্দোলনে অবতীর্ণ হইবে সে সম্পর্কে ব্রিটিশ আমলারা নিঃসন্দেহ ছিলেন। সুতরাং পূর্ব হইতে তাঁহারা সরকারী দমনযন্ত্রটিকে সুদৃঢ় করিতে থাকেন। দ্বিতীয় গোল টেবিল

বৈঠকের ব্যর্থতার সংবাদ ভারতে পৌঁছাইবার পূর্বেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ ও উত্তরপ্রদেশে সরকারী নির্যাতন আরম্ভ হইল। হিজলী বন্দীশালায় গুলিবর্ষণ করিয়া বাংলাদেশের পুলিশ দুইজন রাজবন্দীকে হত্যা করিল এবং সন্ত্রাস দমনের নামে দুইটি অর্ডিন্যান্সও বাংলাদেশে জারি করা হইল। উত্তরপ্রদেশের নিঃস্ব চাষীরা কর দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের উপর নির্দয় পীড়ন আরম্ভ হইল। ঐ প্রদেশে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া করবন্ধ বে-আইনী ঘোষণা করা হইল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর গতিবিধি এলাহাবাদ শহরেই সীমাবদ্ধ করা হইল। ইংল্যাণ্ড-প্রত্যাগত গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া পথিমধ্যে তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খান্ আব্দুল গফ্ফর খান ও তাঁহার ভ্রাতা ডঃ খানসাহেব কারারুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের নেতৃত্বাধীন লালকুর্তা বাহিনী বা খোদাই খিদমৎগার দল বে-আইনী ঘোষিত হইল।

ব্রিটিশ আমলা-কর্তৃক গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ



খান্ আব্দুল গফ্ফর খান

দেশের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে গান্ধীজী দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গান্ধী আরউইন চুক্তি-অনুযায়ী এই সকল বিরোধ আপোসে নিষ্পত্তি করিতে চাহিলেন। বড়লাট গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পক্ষে নূতন সংগ্রামের ডাক দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। কিন্তু এবার তাঁহারা পূর্ব-বারের মত দেশবাসীকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আন্দোলন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বারের তুলনায় অধিকতর হিংস্রভাবে সরকার এই আন্দোলন দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। গান্ধীজী-সহ কংগ্রেসের ছোট-বড় সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান-রূপে ঘোষিত হইল। চারিটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া প্রকাশ্য আন্দোলন বন্ধ করার ব্যবস্থা হইল। কংগ্রেসের অফিস-

সরকারী নির্যাতন

নরগুলি সরকার দখল করিলেন। কংগ্রেসের তহবিল সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। পাইকারী জরিমানা করিয়া গ্রামে শহরে পিটুনী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী বসাইয়া আন্দোলন দমনের ব্যবস্থা হইল। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে বে-আইনী কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের মতে একলক্ষ বিশ হাজার ভারতবাসী ঐ সময়ে কারাবরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ একমত হইতে না পারায় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার ভার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রমিক, উদারনীতিবাদী, রক্ষণশীল—নাম যাহাই হউক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের শ্রেণীচরিত্র পাল্টায় না। শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড নূতন করিয়া তাহাই প্রমাণ করিলেন। সংবিধান রচনার ভার পাইয়া তথাকথিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে তিনি ভারতের জন্য যে-খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি আরও পাকাপোক্তভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা হইল। তিনি প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা তো রাখলেনই, উপরন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু ও নিম্নবর্ণের বা অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে স্বতন্ত্র বা পৃথক নির্বাচন অধিকার দেওয়ার সুপারিশ করিলেন। এই সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল, তখন গান্ধীজী-সহ কংগ্রেসের সকল নেতা-ই জেলে বন্দী। সরকারী ভেদনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মত কোন কর্মী বাহিরে অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং গত্যন্তর না দেখিয়া হিন্দুদের মধ্যে নূতন ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্য ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জেলখানাতেই গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করিলেন। গান্ধীজীর জীবন বিপন্ন দেখিয়া হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা করিলেন। তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা বাতিল হইয়া গেল। গান্ধীজী অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের নামকরণ করিলেন 'হরিজন' এবং এই সময় হইতে প্রত্যক্ষ রাজনীতির বদলে

তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে রামসে ম্যাকডোনাল্ড-কর্তৃক খসড়া সংবিধান রচনা ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

গান্ধীজীর অনশন

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থায় পরিবর্তন

গান্ধীজী হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রচণ্ড সরকারী নির্যাতন, হরিজন আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধির ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের গতি শ্লথ হইয়া আসিল। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহৃত হইল। কংগ্রেস পরাজয় স্বীকার করিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আপাতদৃষ্টিতে ১৯৩০-৩২ খ্রীস্টাব্দের অহিংস গণ-সংগ্রাম ব্যর্থ হইলেও, এই আন্দোলন ভারতবাসীকে অসীম ত্যাগ ও দুঃখ বরণের অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ করিয়া অভীষ্টের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত

জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের ভূমিকাঃ ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত নেহেরু কমিটির রিপোর্টে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন-রীতি বাতিল করা হইয়াছিল যদিও তাহাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করিয়া মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কয়েক দফা দাবি জিন্নাহ্ সাহেব কলিকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে পেশ করেন। তাঁহার দাবিগুলিই ছিল পাকিস্তান গঠনের প্রথম ধাপ। ঐ সময় হইতে তিনি প্রচার করিতে থাকেন যে, হিন্দুদের হাতে মুসলমান স্বার্থ নিরাপদ নয়, মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্বের জন্য রক্ষা-কবচের বিশেষ প্রয়োজন।

পাকিস্তান গঠনের প্রথম ধাপ

(বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী মহম্মদ আলি, জিন্নাহ্ ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে অভিজাত মনোভাবাপন্ন ও পশ্চিমাঘেঁষা রক্ষণশীল। তিনি দীর্ঘদিন জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কংগ্রেসের মডারেট দলভুক্ত হিসাবে তিনি ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলার পক্ষপাতী ছিলেন।) ব্রিটিশ-বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন তিনি কোনদিনই সমর্থন করেন নাই। তিনি মনে করিতেন, ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা পাইবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি কংগ্রেসের সদস্য পদে ইস্তফা দেন।

জিন্নাহ্‌র পরিচয়

কংগ্রেস পরিত্যাগের পরে তিনি কিছুদিন সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরে থাকেন। ভারতীয় রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণায় এক সময়ে ইংল্যাণ্ডে বসবাস

করিতে মনস্থ করেন। অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ সময়ে মুসলমান মধ্যবিত্তরা কংগ্রেস অথবা খিলাফৎ কমিটির সভ্য হইয়া ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত হয়। কিন্তু মুস্তাফা কামাল পাশা খলিফা পদ বিলুপ্ত করায় ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন স্তব্ধ হইয়া যায় এবং ইহার ফলে মুসলমান যুবকদের অনেকে রাজনীতি পরিত্যাগ করে। আবার কেহ কেহ মুসলিম লীগের সভ্য হইয়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে মত্ত হয়। ঐ সময়ে মুসলিম লীগের মতই সাম্প্রদায়িক আরও কয়েকটি মুসলিম সংগঠন স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জটিলতা ও গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এই সমস্ত দল ও সংগঠনকে সমর্থন করিত।

মুসলিম রাজনীতির অবস্থা

শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, চাকুরীক্ষেত্রে হিন্দুদের দ্রুত আধিপত্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হীনম্মন্যতাবোধ পুর্বেই জাগ্রত হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতায় ও শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের ফলে মুসলিম রাজনীতি-বিদদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইল যে, অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে হইবে এবং ব্রিটিশের স্থলাভিষিক্ত হইবে হিন্দুরা। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন করিয়া তাহারা ব্রিটিশকে শত্রু করিয়াছে, সুতরাং ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করিতে পারিবে না; অন্যদিকে হিন্দুদের সঙ্গেও মৈত্রী স্থায়ী হয় নাই। উপরন্তু হিন্দুদের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। এতদ্ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও স্পষ্ট কোন ধারণা মুসলমান বুদ্ধি-জীবীদের ছিল না। সুতরাং অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের অবসানের পর হইতে আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে বিভ্রান্ত, উদ্দেশ্যহীন বাদানুবাদে লিপ্ত এবং আত্মকলহে বহুধা বিভক্ত।

হিন্দুদের মানসিক উৎকর্ষে মুসলমান মধ্যবিত্তদের আতঙ্ক

বিভ্রান্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ

এই সময়ে উর্দু কবি ইকবাল উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলির সমবায়ে গঠিত এক শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য গঠনের স্বপ্ন তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। সম্ভবত কোন উচ্চ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদের প্ররোচনায় চৌধুরী

ইকবালের পরিকল্পনা

রহমৎ আলি নামে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে 'নাও অর নেভার' (Now or Never) নামক একটি পুস্তিকায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমান প্রধান রাজ্যগুলির সমবায়ে পাকিস্তান গঠন ও ভারত বিভাগের পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনাটি মুসলমান মধ্যবিত্তদের মধ্যে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করে। এতদিন তাহারা ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে নৈরাশ্য বোধ করিত, কিন্তু পাকিস্তানের পরিকল্পনা তাহাদের অস্তিত্বকে তাৎপর্যমণ্ডিত ও নূতন আশায় উজ্জীবিত করিয়া তোলে।

চৌধুরী রহমৎ আলীর পাকিস্তান পরিকল্পনা

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ইংল্যাণ্ডে বসবাস করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন এবং মৃতপ্রায় মুসলিম লীগকে কোনভাবে সজীব করিয়া ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে অবতীর্ণ হইলেন। নির্বাচনে তাঁহার দল বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। নির্বাচন-শেষে জিন্নাহ্ কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন প্রদেশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব দিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জিন্নাহ্‌কে বলা হইল যে, দল হিসাবে নয়, ব্যক্তি হিসাবে মুসলিম লীগের সদস্যগণ কংগ্রেস-পরিচালিত মন্ত্রিসভায় যোগদান করিতে পারেন। জিন্নাহ্ এই প্রস্তাবে খুবই মর্মাহত ও আতঙ্কিত হন। তাঁহার ধারণা হইল যে, মুসলিম লীগকে ভারতের রাজনীতি হইতে সমূলে উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস এই প্রস্তাব দিয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে জিন্নাহ্ প্রতিটি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেন।

জিন্নাহ্‌র ভারতে আগমন ও মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ

কংগ্রেসের সঙ্গে আপোসের প্রস্তাব

জিন্নাহ্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে সফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়কে লীগের আধিপত্যে লইয়া আসিতে হইবে। তিনি দ্বিজাতি-তত্ত্ব, হিন্দু আধিপত্যের কাল্পনিক ভীতি জাগাইয়া মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তাঁহার নেতৃত্বে লইয়া আসিলেন। অন্যদিকে 'ইসলাম বিপন্ন' ও 'ধর্মান্তরকরণে'র জিগির তুলিয়া অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুবিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিলেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যে ব্রিটিশ সরকারও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। কংগ্রেসের আধিপত্য রোধ করার জন্য তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেন।

মুসলমান সমাজে জিন্নাহ্‌র একাধিপত্য স্থাপন

ধুরন্ধর জিন্নাহ্ ক্রমশই নিজের গুরুত্ব-সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠেন এবং উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার সম্মতি-ব্যতীত ইংরেজ সরকার ভারতে কোন নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন না বা গুরুতর কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই মুসলিম লীগ বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে ; ঐ সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দিনটিকে 'পরিত্রাণ দিবস' হিসাবে মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে পালন করা হয়। এই ঘটনার এক বৎসর পরে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ভারত বিভাগ-সহ পাকিস্তান গঠন মুসলিম লীগের লক্ষ্যরূপে ঘোষিত হয়। এই-ভাবে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দিয়া ব্রিটিশ সরকার যে-ক্ষুদ্র বিষবৃক্ষটি রোপণ করেন, ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তাহা মহীরুহে পরিণত হয়। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান্ আব্দুল গফ্ফর খান্ এবং আরও কয়েকজন নেতা জিন্নাহ্র দ্বিজাতি-তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধিতা করেন।

ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় জিন্নাহ্র দাবি বৃদ্ধি


মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন ও মোহমুক্তি : ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বহু আলোচিত নূতন শাসনতন্ত্র ভারত-শাসন আইন নামে বিধিবদ্ধ হইল। নূতন শাসন-সংস্কার আইনে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। দেশীয় মন্ত্রিসভা সমস্ত কার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়। শুধুমাত্র জরুরী সময়ের জন্য কার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রাদেশিক গভর্নর বা ছোটলাটদের হাতে অর্পিত হয়।

সংস্কারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা

ভারত-শাসন আইন-সম্পর্কে ভারতের অধিকাংশ নেতাই প্রতিকূল মন্তব্য করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নূতন শাসন-সংস্কারের নামকরণ

করিয়াছিলেন 'ক্রীতদাসত্বের নূতন দলিল'। জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু-প্রমুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ আইনটি সমর্থন না করায়, এই আইন-অনুযায়ী নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া এবং মন্ত্রিসভা গঠন করা সমীচীন হইবে কিনা—সেই সম্পর্কে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরিয়া তীব্র বাদানুবাদ চলে। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ নেতার ইচ্ছানুসারে কংগ্রেস দল নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে, এমন কি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে ব্যর্থ হয়। তাহারা শুধুমাত্র আসাম ও সিন্ধুপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছিল।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও কংগ্রেসের বিপুল জয়

সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরু প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন ইংরেজ গভর্নরদের অধীন মন্ত্রিসভাগুলিতে যোগদান করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোসের মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাতে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাঁহাদের মতে নূতন শাসন-সংস্কার আইন বহুরূপী সাম্রাজ্যবাদেরই একটি বিচিত্র ফাঁদ। কিন্তু কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা বিজয়ের উল্লাসে ও নূতন ক্ষমতালাভের আশায় তাহাদের হুঁশিয়ারী অগ্রাহ্য করিলেন। ছোটলাটরা সাধারণ অবস্থায় প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না—এই আশ্বাস ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর নিকট হইতে আদায় করিয়া প্রথমোক্ত ছয়টি প্রদেশে প্রথমে ও পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন করে।

মন্ত্রিত্ব-গঠনে সুভাষ বসু ও জওহরলালের বিরোধিতা

বড়লাটের আশ্বাসে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গঠন

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভা গঠন করায় সারা দেশে এক নূতন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়া ও কয়েকটি গঠনমূলক কাজ করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিসভা জনসেবার আদর্শ স্থাপন করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নানা কারণে জনগণের নব-জাগ্রত আশা স্থায়ী হইল না।

মন্ত্রিত্ব-গঠনে জনমনে আশার সঞ্চার

বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ফলে কংগ্রেসের মধ্যেই ব্রিটিশ

সরকারের সঙ্গে আপোসের মনোভাব বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকারও এই মনোভাবকে শক্তিশালী করার জন্য ইন্ধন যোগাইতে থাকেন। অন্যদিকে ইউরোপে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ শক্তিশালী হওয়ায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ফ্যাসীবাদের লড়াই শুরু হয়। ইউরোপের ফ্যাসীবাদ বনাম গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদের সংগ্রাম ভারতীয় নেতাদেরও আসিয়া স্পর্শ করে। এই সমস্ত কারণে

ব্রিটিশের সঙ্গে আপোসের মনোভাব

কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ আরম্ভ হয়। আইন পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে আপোসপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। আইনসভার বাহিরে আপোসপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব করেন আজন্ম বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু। মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা-সত্ত্বেও তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ষড়্যন্ত্রের ফলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কংগ্রেস নেতাদের কেহ কেহ তাঁহাকে ফ্যাসিস্ট বলিয়া সম্বোধন করে।

আপোস-বিরোধী সংগ্রামে সুভাষ বসু



সুভাষচন্দ্র বসু

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার সময় দেশে যে-আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে তাহা যেন ধীরে ধীরে নির্বাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত দেশের শাসন-সংস্কার করিতে গিয়া মন্ত্রীরা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন, অর্থাভাবে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির আশানুরূপ উন্নতি হইল না, শ্রমিক-কৃষকদের দুরবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিকার হইল না, সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূরীভূত হওয়া দূরের কথা, উহার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল, কংগ্রেসের মধ্যে ধীরে ধীরে আপোসের মনোভাব উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। মন্ত্রিমণ্ডলীর কেহ কেহ দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু হইল। ইহার ফলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ-সম্পর্কে অনেকের মোহ

মন্ত্রিসভা-সম্পর্কে কংগ্রেসের মোহমুক্তি

ভাঙিয়া গেল। জনগণের নিকট কংগ্রেস হেয় প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। কংগ্রেস-নেতৃত্বের তখন স্পষ্ট ধারণা হইল যে, প্রকৃত স্বাধীনতা না পাইয়া দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে এইরূপই ঘটিবে। স্বাধীনতা অর্জন না করিলে দেশের মঙ্গলবিধান হইবে না। যুগ-যুগ-সঞ্চিত অভিযোগ ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটাইতে হইলে আগে স্বাধীনতা অর্জন প্রয়োজন।

মন্ত্রিসভার কার্যকলাপে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের যখন মোহমুক্তি ঘটিতেছিল, সেই সময়ে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা-সমূহের পদত্যাগ

এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড যোগ দেওয়ায় ভারত সরকারও দেশের মন্ত্রিসভা ও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কোন আলোচনা না করিয়া ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি সমস্ত প্রদেশ হইতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেয়। ইহার ফলে দেশে নূতন সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

প্রশ্নমালা

১। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন কাহার সভাপতিত্বে, কবে অনুষ্ঠিত হয়? ঐ অধিবেশনে কি কি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়? ঐ অধিবেশনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ২৬-এ জানুয়ারীর রাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি-সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

৪। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বা গোল টেবিল বৈঠক কি? উহা ব্যর্থ হইয়াছিল কেন?

৫। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের ভূমিকা আলোচনা কর।

৬। সাইমন কমিশন-সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৭। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গান্ধী-আরউইন চুক্তি কেন স্বাক্ষরিত হইয়াছিল? এই চুক্তির ধারাগুলি আলোচনা কর।

৮। লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর ভূমিকা-সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৯। বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস কেন যোগ দিয়াছিল এবং পরে পদত্যাগই বা করিল কেন?

১০। টীকা লিখ: (ক) ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ভারত সংস্কার আইন, (খ) নেহেরু রিপোর্ট, (গ) দাণ্ডী অভিযান, (ঘ) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের শেষ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবঃ ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত। ইউরোপের এই যুদ্ধ-সম্পর্কে ভারতবাসীর মনোভাব ছিল নির্বিকার ও নিস্পৃহ। জাতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু-ব্যতীত অন্য কোন নেতা গভীর আগ্রহের সঙ্গে এই যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি লক্ষ করেন নাই। সুভাষচন্দ্র বসুই যুদ্ধের সুযোগে হিটলার ও অক্ষশক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় ভারতবাসীর মনেও এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভিযান আরম্ভ করায় ভারতবর্ষ একদিকে যেমন ব্রিটেনের রসদ ও গোলা-বারুদ সংগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হয়, অন্যদিকে তেমনি জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনার প্রধান ব্রিটিশ-ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয়। ইহার ফলে ভারতবর্ষে সিমেন্ট, লৌহ, তাম্র, এ্যালুমনিয়ম প্রভৃতি ভারী-শিল্প উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতবর্ষে বহু কল-কারখানা রাতারাতি স্থাপিত হয়।

যুদ্ধের প্রভাবে শিল্প-প্রসার

ব্রহ্মদেশ এই সময়ে জাপানের অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় ভারতে চাউল আমদানি বন্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে যুদ্ধের চাহিদা পূরণ করিতে গিয়া, ব্রিটিশ সরকার পূর্ব-ভারতের উৎপন্ন চাউল সৈন্যবাহিনীর জন্য নির্বিচারে মজুদ করিতে থাকে। ইহার ফলে বাংলাদেশে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে (বাংলার ১৩৫০ সালে) এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়, ঐ দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আলোচনা না করিয়া ভারত

সরকার ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় কংগ্রেসের পরিচালনাধীন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে।

কংগ্রেসের শর্ত-সাপেক্ষ যুদ্ধ-সমর্থন

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারত সরকারকে বলা হয় যে, কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার স্থাপন করিলে কংগ্রেস ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ৮ই আগস্টের একটি ঘোষণায় ভারত সরকার জানান যে, দেশের একটি শক্তিশালী দল (অর্থাৎ মুসলিম লীগ) অস্থায়ী জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব মানিতে রাজী নয় বলিয়া ভারত সরকার কেন্দ্রে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনে অক্ষম। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যুদ্ধ-শেষে তাঁহারা ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনে আগ্রহশীল। তিনি বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে আরও কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে এবং সমর পরিষদে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে রাজী হন।

ভারত সরকারের আগস্ট ঘোষণা

জাতীয় কংগ্রেস ভারত সরকারের ৮ই আগস্টের প্রস্তাবকে অত্যন্ত অসন্তোষজনক বলিয়া মনে করে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য গান্ধীজীর নির্দেশে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ ও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেস ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দেড় বৎসর ধরিয়া স্নায়ু যুদ্ধ পরিচালনা করে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি পূর্ব-রণাঙ্গনে দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে। যুদ্ধ-পরিচালনায় ভারতবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা-লাভের উদ্দেশ্যে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট চিয়াংকাইশেক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চাপে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোস রফা করিতে আগ্রহ দেখান। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে জাপান-কর্তৃক রেঙ্গুন বিজয়ের তিন দিন পরে ইংল্যাণ্ড হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সমাজতান্ত্রিক সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোস-আলোচনার জন্য অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষে আসিবেন। ক্রীপ্‌স্ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী যথাসময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া দেশের

ক্রীপ্‌সের ভারতে আগমন

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁহাদের নিকট মূলত পূর্ব-উল্লিখিত ভারত সরকারের ৮ই আগস্টের (১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে) প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাবই উত্থাপন করেন। অনতিবিলম্বে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আর মুসলিম লীগ ঐ প্রস্তাবে পাকিস্তান দাবি স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করে। গান্ধীজী ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাবকে পতনোন্মুখ ব্যাঙ্কে ভবিষ্যতে আদায়যোগ্য চেকের **(a post-dated cheque on a crashing bank)** সঙ্গে তুলনা করেন। ফলত ক্রীপসের দৌত্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের ভয়ঙ্কর বিপদের দিনেও পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব পরিবর্তন না করায়, ভারতবর্ষে হঠাৎ ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করে।

কংগ্রেস-কর্তৃক ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

ভারত ছাড় ও আগস্ট আন্দোলন ঃ ক্রীপ্‌সের দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পর হইতে গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধে তিনি ইংরেজদের ভারতবর্ষ ছাড়িতে আদেশ করেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সভায় 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের ভারত পরিত্যাগে বাধ্য করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ঐ আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গান্ধীজীর উপর ন্যস্ত হয়। গান্ধীজী এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করেন যে, ভারতবাসীকে হয় সংগ্রাম করিতে হইবে নতুবা মরিতে হইবে। তাঁহার বাণী করেঙ্গে য়ে মরেঙ্গে, ভারত ছাড় আন্দোলনে ভারতবাসীকে মন্ত্রের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

কংগ্রেসের ভারত ছাড় প্রস্তাব

করেঙ্গে য়ে মরেঙ্গে

সংগ্রাম শুরু করার পূর্বেই ৯ই আগস্ট (১৯৪২ খ্রীঃ) তারিখে গান্ধীজী-সহ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের সংবাদে সমগ্র দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। নেতৃহীন জনগণ গান্ধীজীর অহিংসার বাণী বিস্মৃত হইয়া রেল লাইন উৎপাটন করে, সরকারী অফিসগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে, কোষাগার লুণ্ঠন করে। কল-কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ করিয়া রাখে। বাংলাদেশের কাঁথি ও তমলুকে, বিহার, যুক্তপ্রদেশ,

আগস্ট বিপ্লবের ব্যাপকতা

মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের স্থানে স্থানে অস্থায়ী জাতীয় সরকার পর্যন্ত স্থাপিত হয়। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত স্বতঃস্ফূর্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন আগস্ট অভ্যুত্থান বা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন নামে পরিচিত। সামরিক আইন জারি করিয়া স্থানে স্থানে বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া, বন্দুক ও মেশিনগান অবাধে ব্যবহার করিয়া ইংরেজ সরকার রক্তের বন্যায় এই অভ্যুত্থান ভাসাইয়া দেয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে,

হতাহতের সংখ্যা

আন্দোলন দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার ষাট হাজার ভারতবাসীকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় হাজার খানেক লোককে হত্যা করে, ১৬ শতের অধিক লোককে গুরুতরভাবে জখম করে। সরকার পক্ষ হইতে '৪২-এর আন্দোলনকে কংগ্রেস-পরিচালিত সশস্ত্র বিদ্রোহ-রূপে বর্ণনা করা হয়, অন্যদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, বিয়াল্লিশের আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ।

নেতাজী ও ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী (আজাদ হিন্দ ফৌজ)ঃ আগস্ট আন্দোলন ভারতের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার শেষ আন্দোলন। অতঃপর ভারতকে স্বাধীন করার জন্য যে-সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ হইল তাহার কেন্দ্রভূমি ছিল ভারতের অভ্যন্তরে নয়, ভারতের বাহিরে। ভারতের বাহিরে রোমাঞ্চকর এই সশস্ত্র সংগ্রামের নায়ক ছিলেন নেতৃশ্রেষ্ঠ সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্ব-গৃহে নজরবন্দী

ভারত হইতে সুভাষ বসুর পলায়ন

থাকার কালে কলিকাতা হইতে তাঁহার পলায়ন ঔরঙ্গজেবের কড়া প্রহরা হইতে শিবাজীর পলায়নের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কলিকাতা হইতে পলায়নের পর তিনি বহু পথ পরিক্রম করিয়া স্বাধীন আফগানিস্তানে পদার্পণ করেন এবং তথা হইতে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে মার্চ মাসের ২৮ তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন। বার্লিন হইতে তিনি বেতারে জার্মানির সাহায্যে ভারতবর্ষের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু সুদূর জার্মানিতে বসিয়া ভারতবর্ষে মুক্তি-যুদ্ধ পরিচালনা করা কাগজে-কলমে সম্ভব হইলেও বাস্তবে নয়। তাই সুভাষচন্দ্র, জাপানীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জয় করিলে, তাহাদের সহায়তায় ভারতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৮ সপ্তাহ বিপৎসঙ্কুল পথে ডুবো জাহাজে (submarine) ভ্রমণ করিয়া ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুন জাপানের

রাজধানী টোকিও চলিয়া আসেন। ইতিপূর্বে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জাপান-প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু* জেনারেল মোহন সিংহের সহযোগিতায় আই. এন. এ. বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। এই সৈন্যদলের অধিকাংশই ছিলেন জাপানের হাতে যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় সৈনিক। সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে আসিয়া ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন ভাড়াটিয়া সৈন্যদের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশানুরাগ জাগাইয়া তোলেন। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি সর্বপ্রথম সমাধি লাভ করে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ও সকল প্রদেশের অধিবাসীর সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে সুভাষচন্দ্রের একক নির্দেশে পরিচালিত হইত। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার গভীর দেশপ্রেম স্বাধীনতাস্পৃহা এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁহার বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার এবং চৌদ্দ শত অফিসার এই বাহিনীকে পরিচালনা করিতেন। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের নামে এক-একটি ব্রিগেডের নামকরণ করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে গান্ধী, আজাদ (মৌলানা আবুল কালাম আজাদ), নেহেরু (পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু) প্রমুখ জাতীয় নেতাদের নামে ব্রিগেড তো ছিলই, এতদ্ব্যতীত তিনি 'ঝাঁন্সীর রানী'র নামে একটি নারী-বাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন।

জাপানে আগমন

আজাদ হিন্দ ফৌজ

আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্যের কাহিনী ঃ সুভাষচন্দ্র জাপানী-অধিকৃত সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯-এ অক্টোবর তারিখে ঐ শহরেই অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করেন। আজাদ হিন্দ সরকার জাপানীদের নিকট হইতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গ্রহণ করে এবং উহার নাম দেয় স্বরাজ ও শহীদ দ্বীপ। সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ১৯৪৪

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন

* রাসবিহারী বসুর কার্যকলাপের বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে রেঙ্গুনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ব্রহ্মদেশের জাপ-সেনাপতি কাওয়াবের (Kawabe) সঙ্গে কয়েকটি শর্ত-সংবলতি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ঐ চুক্তিতে স্থির হয় যে, ভারতীয় অফিসারগণই আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল বিভাগের সেনাপতিত্ব করিবেন। ব্রিটিশ কর্তৃত্বমুক্ত ভারতীয় অঞ্চলে আজাদ হিন্দ সরকারের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মুক্ত ভারতীয় ভূখণ্ডে শুধুমাত্র ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন থাকিবে।

জাপ-সেনাপতির সঙ্গে চুক্তি

আজাদ হিন্দ ফৌজের আজাদ, গান্ধী, নেহেরু ব্রিগ্রেডের সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ অস্ত্র, অর্থ, সমর-উপকরণ, খাদ্যসম্ভারের অপ্রতুলতা-সত্ত্বেও যে-সাহস ও সমরকুশলতা প্রদর্শন করে তাহাতে জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষগণও বিস্মিত হন। এই তিনটি ব্রিগেডের বাছাই-করা গেরিলা সৈন্যদের লইয়া গঠিত হয় সুভাষ ব্রিগেড। এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান। সুভাষ-ব্রিগেডের সৈনিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্জয় সাহস, অদ্ভুত দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে কোহিমা রণাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এক যৌথ আক্রমণে উখরুল ও কোহিমা জয় করে এবং আজাদ হিন্দ সরকার মুক্ত ভারতীয় অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা ভারতের মুক্ত অঞ্চলে উড্ডীন হয়। এই সময়ে জাপানী সৈন্যের সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের আর একটি বাহিনী মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অবরোধ করে। কিন্তু ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস হইতে জাপসৈন্যবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পরাজিত হইতে থাকে। ফলে তাহাদের পক্ষে ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজকে যথেষ্ট সাহায্য করা

আজাদ হিন্দ ফৌজের কোহিমা জয়

ইম্ফল অবরোধ


নেতাজী

সম্ভব হইল না এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে ইম্ফল জয় করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে বর্ষা শুরু হওয়ায় ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের রাস্তাগুলি দুর্গম হইয়া উঠিল এবং সৈন্যবাহিনীর নিকট রসদ ও খাদ্যসম্ভার সরবরাহ রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ইহার ফলে প্রথমে জাপানীদেরকে পরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল। এইভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত অভিযান শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের ৪০০০ সৈনিক মৃত্যুবরণ করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের পশ্চাদপসরণ

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের খণ্ডযুদ্ধগুলিতে যে-সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল তাঁহাদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম। সুভাষচন্দ্র এই দেশপ্রেম তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের নিকট সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন দেবদুর্লভ সম্মানে সম্মানিত। তিনি ছিলেন তাঁহাদের প্রিয় নেতাজী।

জাপানী সংবাদ-সূত্রে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩-এ আগস্ট তারিখে তাইহোকু বিমানবন্দরে এক দুর্ঘটনায় নেতাজীর জীবনের অবসান হয়। এই সংবাদের সত্যতা-সম্পর্কে বহু সন্দেহ ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় ভারত সরকার শাহ্‌নওয়াজ খান ও বিচারপতি খোসলার নেতৃত্বে পর পর দুইটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন দুইটি জাপানী সংবাদটিকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।

নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ

সুভাষচন্দ্র বসুই একমাত্র ভারতীয় নেতা যিনি ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবার জন্য বিদেশে একটি সৈন্যবাহিনী ও অস্থায়ী স্বাধীন সরকার স্থাপন করিয়া ভারতের প্রায় ১৫০ মাইল ভূখণ্ড ব্রিটিশ শাসন-মুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দান অপরিমেয়।

ভারত সরকার ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ৫ই নভেম্বর তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন জন নেতা কর্নেল ধীলন, মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান, কর্নেল পি. কে. সায়গলকে বিশ্বাসঘাতকতা ও দলত্যাগ করিয়া জাপানীদের সঙ্গে যোগদানের অভিযোগে দিল্লীর ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় বিচার আরম্ভ করেন, বিচারে তিন জনেরই কঠোর কারাদণ্ডাদেশ হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত সকলেই মুক্ত হন। ভারত

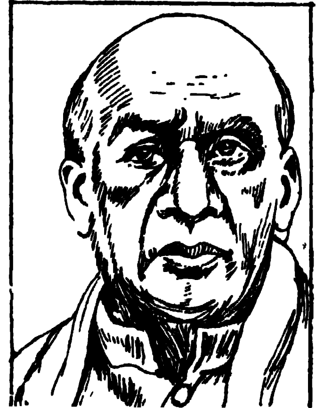
আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার

সরকার ভাবিয়াছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দীদের ভারতের মাটিতে বিচার করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে পারিলে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় সৈনিকদের ভক্তি ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে, কিন্তু এই বিচারের ফলে হিতে বিপরীত হইল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার-প্রহসন সৈন্যবাহিনীর উপরও এক গভীর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল এবং ঐ প্রতিক্রিয়ায় সরকারী দেশরক্ষা বাহিনীর নৌ, বিমান ও সৈন্য বিভাগে স্বাধীনতার স্পৃহা বিদ্যুদ্‌বেগে ছড়াইয়া পড়িল এবং এই স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষাই বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহের প্রধান কারণ।

বিচারের প্রতিক্রিয়া

নৌ-বিদ্রোহ ঃ (বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারি।) পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল এই বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণ, কিন্তু একটি প্রত্যক্ষ কারণ ইহাকে ত্বরান্বিত করে। রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে চিরদিনই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ ছিল। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দেশীয় যুবক কর্মীরা উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারে ও জাতীয় চরিত্র-সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তিতে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া কতকগুলি নৌ-যান অধিকার করে এবং কামান বন্দুক লইয়া ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে রাজকীয় ভারতীয় বাহিনীর ফ্ল্যাগ-অফিসার এ্যাডমিরাল গড্‌ফ্রে দেশীয় নৌ-কর্মচারীদের আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান জানান এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত এই বিদ্রোহের উপশম ঘটে।

বিদ্রোহের কারণ


সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

ভারতীয় নৌ-সৈনিকরা প্যাটেলের মধ্যস্থতায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট ২৩-এ ফেব্রুয়ারি আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিষেধ-সত্ত্বেও বোম্বাইয়ে হরতাল ডাকা হয় এবং হরতালের সময়ে বোম্বাইয়ে প্রবল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে এবং দুই শতেরও অধিক লোক নিহত

বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ

হয়। বোম্বাইয়ের প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতা, মাদ্রাজ ও করাচীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। এই বিদ্রোহ ভারতীয় নৌবহরেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে নাই। শীঘ্রই স্থলসৈন্য ও রাজকীয় বিমান-বাহিনীতেও বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ দুইটি বাহিনীতে এই বিদ্রোহ কখনও ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারণ করে নাই। নৌ-বিদ্রোহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিল যে, ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারত শাসন করা আর সম্ভব নয়।

বিদ্রোহের শিক্ষা

নৌ-বিদ্রোহের ইঙ্গিত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই বিদ্রোহের পরের দিনই ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি সাহেব ঘোষণা করেন যে, অনতিবিলম্বে ভারতে একটি ক্যাবিনেট মিশন প্রেরিত হইবে এবং ঐ মিশন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আত্মকর্তৃত্বমূলক শাসনতন্ত্র রচনা-সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অচল-অবস্থা অবসানের ব্যর্থ ব্রিটিশ প্রচেষ্টা ঃ ইতিপূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার কালে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স ভারতীয়দের সঙ্গে আপোস মীমাংসা করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তিনি ঐ সময়ে কি প্রস্তাব দিয়াছিলেন এবং কি কারণে ঐ মীমাংসা প্রস্তাব ব্যর্থ হইল তাহা এখানে বিশদভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

ক্রীপ্‌স মিশনের প্রস্তাব ও উহার শর্তাবলীর আলোচনা ঃ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কংগ্রেস-সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভের জন্য ক্রীপ্‌স সাহেব যে-প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিলে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে পারিবে। (২) যুদ্ধান্তে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি সংবিধান সভা গঠিত হইবে এবং ঐ সভায় রচিত সংবিধান ব্রিটিশ সরকার মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা হইল যে, এক বা একাধিক প্রদেশ যদি স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে চায় তাহা হইলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করিবে। (৩) কিন্তু যুদ্ধ প্রতিরক্ষা ও দেশের নিরাপত্তার ভার সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের হাতেই ন্যস্ত থাকিবে।

ক্রীপ্‌সের প্রস্তাবাবলী

ক্রীপ্‌সের প্রস্তাবের শর্তগুলি আলোচনা করিলে স্বাভাবিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধকালে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থায় কোন শৈথিল্য আনিতে চাহেন নাই এবং ভারতবাসীর হাতে বিন্দুমাত্র শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে চাহেন নাই! দ্বিতীয়ত, ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে জিন্নাহ্ ও মুস্‌লিম লীগ ভারত বিভাগের যে-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল, ক্রীপ্‌সের প্রস্তাবের দ্বিতীয় শর্তে সেই দাবিকে পরিপূর্ণভাবে না হইলে ও বহুলাংশে উৎসাহিত করা হইয়াছিল এবং এই দুইটি কারণেই কংগ্রেস ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ফলে ক্রীপ্‌সের আপোস-রফার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়।

ক্রীপ্‌স দৌত্যের ব্যর্থতা

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নৌ-বিদ্রোহে আতঙ্কিত হইয়া ক্লীমেণ্ট এটলি ক্যাবিনেট মিশন নামে একটি মিশন ভারতে প্রেরণ করেন। এই মিশনের সদস্য ছিলেন বাণিজ্য-সচিব ক্রীপ্‌স, নৌসেনাপতি মিঃ আলেক-জাণ্ডার ও ভারত-সচিব পেথিক লরেন্স। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত ভারতে থাকিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে তাঁহারা আলোচনা করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসানের জন্য একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি 'ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রস্তাবটিতে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলা হয়। বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের উপর এবং শাসন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় প্রদেশের হস্তে অর্পণের সিদ্ধান্ত হয়। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য ও উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি ছয়টি হিন্দু-প্রধান অঞ্চলকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবকে আর একটি বিশেষ শ্রেণীতে, বাংলা ও আসামকে স্বতন্ত্র আর একটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তিনটি তালিকা-ভুক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনা করিবেন বলিয়া নির্দিষ্ট হয় এবং সংবিধান-অনুসারে যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, সেই নির্বাচনের পরে যে-কোন প্রদেশ স্বেচ্ছায় যে-কোন তালিকা বা শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া অন্য তালিকা- বা শ্রেণীভুক্ত-

ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণ

ক্যাবিনেট মিশনের শর্তাবলী

হইতে পারিবে বলিয়া স্থির হয়। এতদ্ব্যতীত মিশন দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সুপারিশ করে এবং ঐ সরকারে ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের গ্রহণ করিতে বলা হয়।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ

ভারতের প্রধান প্রধান দলগুলি নানা আপত্তি-সত্ত্বেও ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবটি মানিয়া লয় এবং গণ-পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে।

নির্বাচন

গণ-পরিষদের নির্বাচন শেষ হইলে দেখা গেল যে, কংগ্রেস ও তাহার অনুগামীরা ২৯৬ জন সদস্য-বিশিষ্ট সংবিধান সভা বা গণ-পরিষদের ২২০টি আসন সংগ্রহ করিয়াছে। কংগ্রেসের এই বিপুল সাফল্যে এবং নব-নিযুক্ত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ১০ই জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে শঙ্কিত হইয়া গণ-পরিষদে যোগ দিতে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিলেন এবং পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য ১৬ই আগস্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। তবে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করা হইল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে বাংলাদেশের মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতাদের প্ররোচনায় কলিকাতার নিরীহ হিন্দুদের যে-ভাবে হত্যা করা হয়, সভ্য পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। কলিকাতার হাঙ্গামার পরে নোয়াখালি, কুমিল্লা জেলাতেও মুসলিম লীগের জল্লাদরা ব্যাপকভাবে হিন্দুহত্যা, গৃহদাহ, নারীহরণ ও নারীর মর্যাদা-হানি করে। মুসলিম লীগের এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় বিহার, বোম্বাই প্রভৃতি হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায়, ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য, প্রতিটি শহর, প্রতিটি গ্রাম যুধ্যমান দুইটি পক্ষে বিভক্ত হইয়া যায়। কলিকাতার ঘৃণ্য ও কুৎসিত দাঙ্গা জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি-তত্ত্বকে বায়বীয় স্তর হইতে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে।

নির্বাচনে কংগ্রেস সাফল্য

মুসলিম লীগ সহযোগিতায় অস্বীকৃত

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

সারা-ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিস্তার

অন্তর্বর্তী সরকার ঃ ক্যাবিনেট মিশন ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ করিয়াছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যোগদান

কিছু কাল ধরিয়া অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য আসন লইয়া তর্কাতর্কির পরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলই বড়লাটের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয় আর কোণঠাসা হওয়ার ভয়ে মুসলিম লীগ অক্টোবর মাসে এই সরকারে যোগদান করে।

মুসলিম লীগ কোন শুভবুদ্ধি লইয়া অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয় নাই। সারা দেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাহারা যে-স্নায়ুযুদ্ধ শুরু করিয়াছিল সেই যুদ্ধকে তীব্রতর করার জন্যই ক্যাবিনেটে যোগদান করিয়াছিল। ইহার ফলে অন্তর্বর্তী সরকার কয়েকদিনের মধ্যে অচল হইয়া পড়িল। মুসলিম লীগ প্রথম হইতে

মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদানে অসম্মত

গণ-পরিষদ বয়কট করিতে থাকে এবং ইহার ফলে ভারতবর্ষে খুবই তিক্ততার সৃষ্টি হয়। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নানা চেষ্টাচরিত্র করিয়াও জিন্নাহ্‌কে গণপরিষদে যোগদানে রাজী করাইতে পারেন নাই। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লীগ-নেতা জিন্নাহ্ ও লিয়াকৎ আলী কংগ্রেস-নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শিখ সম্প্রদায়ের নেতা বলদেব সিংহের সঙ্গে তিনি ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনার জন্য গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি জিন্নাহ্‌র অন্যায় জেদ ভাঙিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য অবশেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২০-এ ফেব্রুয়ারি

ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে এট্‌লির ঘোষণা

ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের পূর্বেই ইংরেজরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবেন। ভারত পরিত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহারা সম্ভবপর হইলে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন। কিন্তু উপযুক্ত কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ না পাওয়া গেলে কোন কোন স্থলে প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে অথবা প্রয়োজন বোধ করিলে কোন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিবেন। ক্লিমেন্ট এট্‌লির এই ঘোষণায় ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের ব্যাঘাতক শক্তিগুলি আরও পুষ্ট হইয়া উঠে।

বাংলা, বিহার, বোম্বাইয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইলেও এতদিন পর্যন্ত পাঞ্জাবে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই। ওখানকার

ইউনিয়নিস্ট দলের মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খান পাঞ্জাবে কোনক্রমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু এট্‌লির ঘোষণার অব্যবহিত পরেই খিজির মন্ত্রিসভার পতন ঘটিল এবং হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের জল্লাদরা এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। মুলতান ও অমৃতসরের মত শহর কয়েকদিনের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের ফলে পূর্বে যাঁহারা দেশবিভাগের বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও এই অরাজকতার হাত হইতে মুক্তি-লাভের আশায় দেশবিভাগে সম্মতি দিলেন, কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই দেশবিভাগকে মানিয়া লইতে রাজী হইলেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে অবশ্য ঐ সময়ে আরও একটি বিশেষ কারণে দেশবিভাগের সম্মতি দিতে হইয়াছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ঘোষণায় এট্‌লি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রধান দলগুলি মিলিতভাবে যদি দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে দেশের বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের শাসন-কর্তৃত্ব ব্রিটিশ সরকার তাহাদের বিবেচনায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তরিত করিবেন। জওহরলাল নেহেরু-প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হইলেন এই ভাবিয়া যে, এই ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ শুধুমাত্র দ্বিধাবিভক্ত হইবে না ; ইউরোপের বল্কান অঞ্চলের মত বহু রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে। বহু রাজ্যে বিভাজনের হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করাই তখন কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বহু রাজ্যের অরাজকতা এবং পাকিস্তান দাবি স্বীকার—এই দুইটি অভিশাপের মধ্যে কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী, জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল-প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন। শুধুমাত্র গান্ধীজী প্রথম পর্যায়ে বহু রাজ্যের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনিও নেহেরু, প্যাটেল-প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মতে সায় দেন।

পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের দেশবিভাগে সম্মতির কারণ

দেশবিভাগ স্বীকার করিয়া ভারতকে খণ্ডীকরণের হাত হইতে রক্ষার অভিপ্রায়



জে. বি. কৃপালনী

জাগিয়া উঠিবে। ইতিহাসে এমন পরম মুহূর্ত কদাচিৎ আসে যে-মুহূর্তে একটি যুগের মৃত্যু হয় এবং যে-মুহূর্তে আমরা পুরাতন ও জীর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া নূতনকে সাগ্রহে বরণ করি, যে-লগ্নে দীর্ঘকাল ধরিয়া অবদমিত জাতির আত্মা বাঙ্ময় হইয়া উঠে। আজিকার এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা মনে করি ভারত, ভারতবাসী ও বিশ্বমানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প গ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়াছে।”*[১]

প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষ ঃ স্বাধীনতালাভের পরে একযোগে ভারতবর্ষকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল বাস্তুহারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে এবং এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

উদ্বাস্তু সমস্যা

এতদ্ব্যতীত দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিধিবদ্ধ ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে উল্লিখিত ছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটেনের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা নির্ধারণ করিতে পারিবে। সুতরাং এই আইনের ফাঁকে দেশীয় রাজাদের কেহ কেহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে চেষ্টা করেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৩৬২টি*।[২] রাজ্যগুলি স্বাধীন থাকিলে ভারতবর্ষ বল্কান অঞ্চলের মত অরাজক স্থানে পরিণত হইত। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কৃতিত্বে স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে এই রাজ্যগুলির অধিকাংশ ভারতীয় যুক্তরাজ্যে যোগদান করে। শুধু বাকি ছিল হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর। কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানাদাররা আক্রমণ করিলে কাশ্মীরের মহারাজা ভারতীয় ইউনিয়নে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ অক্টোবর যোগদান করেন। জুনাগড়ের প্রজারা গণভোটের মাধ্যমে জুনাগড়ের নবাবকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানে বাধ্য করে। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে হায়দারাবাদের নিজাম স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করিলে ভারত সরকার পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া হায়দ্রাবাদকে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করেন।

দেশীয় রাজ্য একত্রীকরণের সমস্যা

১. গ্রন্থকার-কর্তৃক জওহরলাল নেহেরু-কর্তৃক ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে মধ্যরাত্রে প্রদত্ত বক্তৃতার ভাবানুবাদ।

২. **Percival Spear : A History of India, Vol. II. p. 240.**

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রায় আড়াই বৎসর পরে ভারতবর্ষকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষের সংবিধান-রচনার কাজ স্বাধীনতালাভের পূর্বে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দেই শুরু হয়। অনেক আলাপ-আলোচনার পরে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যেই সংবিধান-রচনার কাজ সমাপ্ত হয় এবং স্বাধীন ভারতের গণপরিষদে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ জানুয়ারি তারিখে নূতন সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সংবিধানে ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হয়। তবে বাস্তব কতকগুলি সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। সাড়ে সতের কোটি ভোটার-যুক্ত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। অতি দ্রুত বৃহৎ সংবিধানটি রচনার প্রধান কৃতিত্ব তপশীলী নেতা ডঃ আম্বেদকরেরই প্রাপ্য। প্রাচীন ভারতের সামাজিক শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনা করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মনু। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের সর্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ঐ শাসনতন্ত্রে তিনি মনুষ্যত্বের অবমাননাই করিয়াছিলেন। বহু শতাব্দীর ব্যবধানে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করিলেন এক শূদ্রকুলোদ্ভব তপশীলী নেতা ডঃ আম্বেদকর। শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের সর্বপ্রকার সামাজিক অধিকার দিয়া এই সংবিধানে তিনি মুনষ্যত্বের মহিমা পুনঃস্থাপন করিলেন।

ভারতের নূতন সংবিধান, প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

সংবিধান-রচয়িতা ডঃ আম্বেদকর


ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

প্রশ্নাবলী

১। আগস্ট বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

২। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর স্থান নিরূপণ কর।

৩। আজাদ হিন্দ ফৌজ কি? তাহাদের শৌর্যের কাহিনী কি জান? ভারতে তাঁহাদের বিচার কেন হইয়াছিল?

৪। নৌ-বিদ্রোহ-সম্বন্ধে কি জান?

৫। ক্রীপ্‌স প্রস্তাব আলোচনা করিয়া ক্রীপ্‌স মিশনের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৬। ক্যাবিনেট মিশন কি? ভারতবাসীর সঙ্গে আপোস-রফার জন্য তাহারা কি প্রস্তাব দিয়াছিলেন? উহা কার্যকর হয় নাই কেন?

৭। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা-সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

৮। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভারত বিভাগ-স্বীকার করিলেন কেন?



ভারতীয় সংবিধানের রূপ-রেখা

প্রথম অধ্যায়

সংবিধান প্রণয়ন ও ইহার বৈশিষ্ট্য

(ক) স্বাধীন ভারত : গণ-পরিষদ : সংবিধান প্রণয়ন :

বিদেশী শাসনের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভারতীয় জনগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া আন্দোলন করে। গণ-আন্দোলনের চাপে পড়িয়া ইংরেজ সরকার অবশ্য মাঝে মাঝে কিছু সংস্কারমূলক আইন পাশ করে, যেমন—১৯০৯ ও ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আইন এবং ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ইহাতে মিটে না। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের 'আগস্ট প্রস্তাব' এবং ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ক্রীপ্‌স্ মিশনের প্রস্তাবও জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

ইহার পর ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস দল মানিয়া লইলেও মুসলিম লীগের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি কার্যকর করা সম্ভব হয় না। এই সময় গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করিবার পর মাউন্ট-ব্যাটেন ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—এই প্রধান দল দুইটি ভারত বিভাগের প্রস্তাব মানিয়া লয়। ফলে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ হয় এবং অখণ্ড ভারত দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়—ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান।

স্বাধীন ভারতের জন্য একটি নূতন সংবিধান রচনার জন্য 'গণ-পরিষদ' গঠিত হয়। এই গণ-পরিষদ গঠিত হয় (ক) প্রাদেশিক আইনসভা-কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য এবং (খ) দেশীয় রাজ্য-কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। গণ-পরিষদ ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সংবিধানের খসড়া রচনা সমাপ্ত করে। ঐ বৎসরের ১৫ই নভেম্বর হইতে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত খসড়ার উপর বিশদ আলোচনা হয় এবং প্রায় ৭৬৩৫টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ নভেম্বর নূতন সংবিধান গৃহীত হয় এবং ইহা ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ জানুয়ারি হইতে কার্যকর করা হয়।

খ. প্রস্তাবনা :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতীয় সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সংযোজিত হইয়াছে। প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশ নয়। ইহার সাহায্যে জনগণ কোন অধিকার দাবি করিতে পারে না। তবে ইহার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সংবিধান-রচয়িতাগণ সমাজের কোন্ দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করিতে চান তাহার আভাষ প্রস্তাবনায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের কোন শব্দ বা বাক্যাংশ অস্পষ্ট থাকিলে প্রস্তাবনার সাহায্যে তাহার ব্যাখ্যা করা যায়।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা হইতে আমরা তিনটি জিনিস জানিতে পারি—(১) সংবিধানের উৎস, (২) নূতন ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং (৩) কি কি আদর্শ ও নীতি সংবিধান সফল করিতে চায়। প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে, "আমরা ভারতীয় জনগণ......এই সংবিধান রচনা, বিধিবদ্ধ এবং গ্রহণ করিলাম।" অর্থাৎ সংবিধানের উৎস জনগণ এবং জনগণের দ্বারাই ইহা রচিত ও গৃহীত। কিছু সমালোচক বলেন, যে গণ-পরিষদ সংবিধান রচনা করিয়াছে তাহা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের দ্বারা গঠিত এবং ইহার সদস্যগণ ভারতীয় জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত হন নাই। এতদ্ব্যতীত, জনগণের অনুমোদনের জন্য ইহা কখনও জনসাধারণের নিকট পাঠান হয় নাই। অতএব এই সংবিধান জনগণ-কর্তৃক রচিতও নয়, গৃহীতও নয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনগণ যে-পার্লামেন্ট গঠন করে, সেই পার্লামেন্ট নূতন সংবিধানকে মানিয়া লইয়াছে। অতএব সংবিধানের ভিত্তি-যে জন-সম্মতি তাহা অস্বীকার করা যায় না।

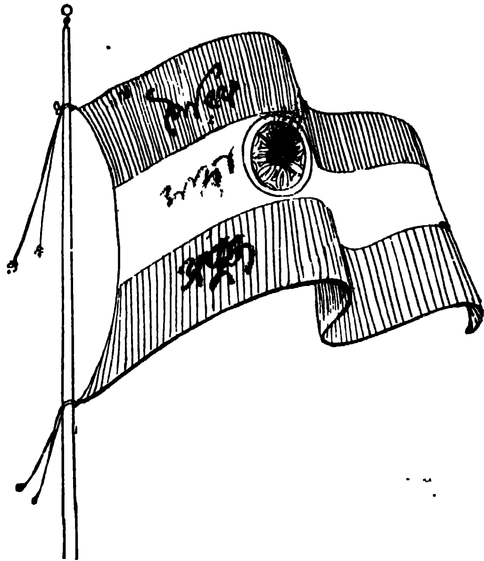
প্রস্তাবনায় ভারত-রাষ্ট্রের স্বরূপ কি তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়ন হইবে একটি 'সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও প্রজাতন্ত্রী' রাষ্ট্র। এই সংবিধান কার্যকরী হইবার পর ভারত আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। কোন বিদেশী রাষ্ট্র আর ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রস্তাবনায় ভারতকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতে রাজতন্ত্র এবং সর্বরকম উত্তরাধিকার পদ বিলুপ্ত হইল। ভারতের শাসক-প্রধান রাষ্ট্রপতি হইবেন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত পদাধিকারী। ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অর্থাৎ জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

জনগণ-কর্তৃক, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্যই ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইবে।

সর্বশেষে প্রস্তাবনায় সংবিধানের চারিটি আদর্শের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই চারিটি আদর্শ হইল ন্যায়-প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়-বিচার ; মতপ্রকাশ, চিন্তা, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং সকলের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীভাব জাগ্রত করিয়া একটি মহান সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এই সংবিধানের উদ্দেশ্য। অতএব প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশ না হইলেও ইহার একটি মূল্যবান অংশ। প্রস্তাবনা সংবিধানের চাবিকাঠি।

(গ) জাতীয় পতাকাঃ

গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২২-এ জুলাই ভারতের জাতীয় পতাকা কি হইবে স্থির করে এবং ১৪ই আগস্টের মধ্যরাত্র হইতে এই পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। গণ-পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় পতাকা হইবে সমান আকার-বিশিষ্ট তিনটি রং-এর দ্বারা গঠিত। রং তিনটি হইতেছে গৈরিক, সাদা এবং ঘন সবুজ। রংগুলি সমান্তরালভাবে থাকিবে এবং উপরে গৈরিক, মাঝখানে সাদা ও নীচে সবুজ রঙ থাকিবে। পতাকার সাদা অংশের মাঝখানে একটি চক্র থাকিবে এবং এই চক্র সারনাথে অশোকের চক্রের অনুকরণে অঙ্কিত হইবে। পতাকার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত হইবে ২ : ৩।



ভারত সরকার জাতীয় পতাকা ব্যবহারের কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া

দিয়াছে। প্রথমত, জাতীয় পতাকার উপরে কোন পতাকা থাকিবে না। দ্বিতীয়ত, জাতীয় পতাকার সঙ্গে অন্য পতাকা থাকিলে সেগুলি বামদিকে থাকিবে। তৃতীয়ত, একই সঙ্গে অন্য পতাকা উত্তোলন করিলে জাতীয় পতাকা সর্বোচ্চে থাকিবে। চতুর্থত, জাতীয় পতাকা দেওয়াল বা অন্য কিছুতে সমান্তরালভাবে স্থাপন করিলে গৈরিক অংশ উপরে থাকিবে এবং লম্বভাবে রাখিলে গৈরিক অংশ ডানদিকে থাকিবে।

(ঘ) জাতীয় সঙ্গীত ঃ

প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীত আছে। এই সঙ্গীত অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। সরকারী প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এই সঙ্গীত বাজান হয়। আমাদের দেশের প্রতিনিধি বিদেশে সফর করিলে সেই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও বাজাইতে হইবে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৪-এ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত 'জনগণমন' গানটি জাতীয় সঙ্গীত-রূপে গৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'বন্দেমাতরম্' গানটিকেও জাতীয় সঙ্গীতের সমান মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। 'জনগণমনের' যে-অংশটুকু জাতীয় সঙ্গীতরূপে পরিগণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

জনগণমন-অধিনায়ক, জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা
জনগণমঙ্গলদায়ক, জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।

(ঙ) ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ঃ

সংবিধান হইতেছে একটি দেশের অভীষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ কি ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা পত্তন করা হইবে এবং কিরূপ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার মৌল নীতিগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। তাই দেশভেদে সংবিধানের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন হয়। ভারতীয় সংবিধানেরও তেমনি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

ভারতীয় সংবিধান শুধু লিখিত নয়, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তমও বটে। এই সংবিধানে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৯টি তপসীল (Schedule) আছে। ইতিমধ্যেই ৩০টি সংশোধনের ফলে সংবিধানের কলেবর আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়ঃ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতি হইতেছে যে, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক হইবে সহযোগিতামূলক, অধীনতামূলক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ভারতে বর্তমান। যেমন, দ্বিবিধ সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগ ও আংশিক সংবিধানের প্রাধান্য। কিন্তু সংবিধানে নানাভাবে কেন্দ্রকে বেশি শক্তিশালী করা হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভাকে যথাক্রমে ৯৭টি ও ৬৫টি বিষয়ে অনন্য ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সংবিধানের ২৪৯, ২৫০ এবং ২৫২নং ধারার বলে পার্লামেণ্ট রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন পাশ করিতে পারে। যুগ্ম-তালিকাভুক্ত ৪৭টি বিষয়েও কেন্দ্রীয় প্রাধান্য বর্তমান। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ২৫৬ এবং ২৫৭ নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে এবং এই নির্দেশ মান্য না করিলে কেন্দ্র রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে (৩৬৫নং ধারা)। আর্থিক বিষয়েও রাজ্য সরকার অনেকখানি কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। তদুপরি রাজ্যের শাসকপ্রধান রাজ্যপাল প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রের প্রতিনিধি। এক নাগরিকত্ব, আন্তঃরাজ্য পরিষদ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন—এ-সবকিছুই কেন্দ্রীকরণের প্রবণতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। অতএব, ভারতকে একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া 'আধা-যুক্তরাষ্ট্র' বলাই সমীচীন।*

আংশিক সুপরিবর্তনীয় ও আংশিক দুষ্পরিবর্তনীয়ঃ ভারতীয় সংবিধান আংশিক সুপরিবর্তনীয়, আংশিক দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধানের কিছু কিছু ধারা পার্লামেণ্ট এককভাবে সাধারণ সংখ্যাধিক্যে এবং কিছু কিছু ধারা

* The Indian Constitution "establishes, indeed, a system of government which is almost quasi-federal...a Unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features"

—K. C. Wheare.

দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে সংশোধন করিতে পারে। এদিক হইতে সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। কিন্তু কতকগুলি ধারা পরিবর্তন করিতে হইলে পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশের মত এবং রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেকের অনুমোদন প্রয়োজন। এদিক হইতে ইহা দুষ্পরিবর্তনীয়।

মিশ্রিত শাসনব্যবস্থাঃ ভারতে পার্লামেন্টারী ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সংমিশ্রণ হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনত শাসকপ্রধান কিন্তু কার্যত নিয়মতান্ত্রিক শাসক। প্রকৃত শাসন পরিচালনা করে মন্ত্রিসভা। ভারতে বিচারালয়ের প্রাধান্য ও পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পার্লামেন্ট শুধু জাতীয় মূলনীতিই স্থির করে না, মন্ত্রিসভাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে পার্লামেন্ট-কর্তৃক প্রণীত আইনকে সুপ্রীম কোর্ট বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

ধর্ম-নিরপেক্ষতাঃ ধর্ম-নিরপেক্ষতা ভারত-রাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে কিন্তু 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' বলিয়া কিছু নাই। ধর্মের ভিত্তিতে সরকার নাগরিকদের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে পারিবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতে দ্বি-নাগরিকত্ব নাই। ভারতের যে-কোন অঞ্চলের অধিবাসীই ভারতীয় নাগরিক। বাঙালী, বিহারী বা মাদ্রাজী বলিয়া কোন নাগরিকত্ব নাই। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আমরা এইবার একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।)

(চ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ঃ

সংবিধানের ১নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় ইউনিয়ন নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি লইয়া গঠিত হইবে : (১) রাজ্যসরকারের অঞ্চলগুলি, (২) কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি, এবং (৩) অন্যান্য যে-সব অঞ্চল প্রাপ্ত হইবে। ২নং ও ৩নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্ট বর্তমান রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে, নতুন রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে বা রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারিবে। রাজ্যের সীমানা পরির্তনের সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মত নিতে পারে কিন্তু ইহার সম্মতি বাধ্যতামূলক নয়। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ করা হয় এবং ইহার পরও কয়েকটি রাষ্ট্র ভাঙিয়া একাধিক রাষ্ট্র গঠন করা হয়। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নিম্নভাবে গঠিত :

(১) কেন্দ্রীয় সরকার, (২) ২১টি রাজ্যসরকার, (৩) ৯টি কেন্দ্রীয়-শাসিত সরকার।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠন

কেন্দ্র	অঙ্গরাজ্য (২১টি)	কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল (৮টি)
	(অন্ধ্র, আসাম, বিহার, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাডু, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যাণ্ড, হরিয়ানা, হিমাচল, মণিপুর, ত্রিপুরা ও মেঘালয়)	(দিল্লী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জ, গোয়া, দমন ও দিউ, পণ্ডিচেরী, চণ্ডীগড়, মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ)।

(ছ) কেন্দ্রীয় আইনসভা ঃ

পার্লামেণ্ট ঃ সংবিধানের ৭৯নং ধারা-অনুযায়ী পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

রাজ্যসভা ঃ ২৫০ জন সদস্য লইয়া রাজ্যসভা গঠিত হইবে। ইহার মধ্যে (১) ২৩৮ জন সদস্য নির্বাচিত হইবে রাষ্ট্র ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি হইতে এবং (২) ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক মনোনীত হইবেন যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও সমাজ সেবায় প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ। ইউনিয়ন অঞ্চলে একটি 'নির্বাচক সংস্থা' রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করে এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। সদস্যগণ এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

রাজ্যসভার সদস্য হইতে হইলে ৩০ বৎসর বয়স এবং তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। ইহা একটি স্থায়ী সভা, তবে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি।

লোকসভা ঃ পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। ৮১নং ধারা-অনুযায়ী বর্তমানে অনধিক ৫২৫ জন সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত হইবে।

ইহার মধ্যে ৫০০ জন প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা রাজ্যগুলি হইতে এবং ২৫ জন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইবে। ৩৩০নং ধারা-অনুযায়ী তফসিলী জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত আছে এবং ৩৩১নং ধারা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ২ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের লোক মনোনীত করিতে পারেন। সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। লোকসভার সদস্য হইতে হইলে, ভারতীয় নাগরিক এবং ২৫ বৎসের বয়স হইতে হইবে। স্পীকার লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন।

পার্লামেণ্টের কাজ ঃ পার্লামেণ্টের নানাবিধ কাজ আছে। প্রধানত ইহার কাজ আইন প্রণয়ন করা। কেন্দ্রীয় তালিকার ৯৭টি বিষয়ে পার্লামেণ্টের আইন পাশের ক্ষমতা অনন্য। যুগ্ম-তালিকাভুক্ত ৪৭টি বিষয়েও পার্লামেণ্ট আইন পাশ করিতে পারে। ২৪৯, ২৫০ এবং ২৫২নং ধারার বলে বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়েও পার্লামেণ্ট আইন পাশ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পার্লামেণ্ট শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কাজের জন্য লোকসভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকেন। লোকসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করিতে হয়।

তৃতীয়ত, পার্লামেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। পার্লামেণ্টের অনুমতি ছাড়া কর ধার্য বা ব্যয়-নির্বাহ করিবার ক্ষমতা সরকারের নাই। এক্ষেত্রেও অবশ্য ক্যাবিনেটের ইচ্ছাই বলবৎ হয়।

চতুর্থত, পার্লামেণ্টের অন্যান্য কতকগুলি ক্ষমতাও আছে। যেমন— রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও অসদাচরণের অজুহাতে অপসারণ ইত্যাদি। সংবিধান সংশোধনেও পার্লামেণ্ট অংশ গ্রহণ করে।

পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের সম্পর্ক ঃ আইনসভার দুই কক্ষের সম্পর্ক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। গ্রেট ব্রিটেনে নিম্নকক্ষ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী, উচ্চকক্ষের বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষ অপেক্ষা বেশি ক্ষমতাশালী। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডে উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতাশালী। ভারতে পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ

কতকগুলি বিষয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন, সাধারণ বিল যে-কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। উভয় কক্ষে বিলটি

পাশ হইলেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া বিল আইনে পরিণত হয়। কিন্তু কোন বিল সম্বন্ধে দুইটি কক্ষ একমত না হইলে, রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন ডাকেন এবং ঐ অধিবেশনে বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় লোকসভার মতই প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির ইম্‌পিচ্‌মেন্ট, উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণেও দুই কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ে লোকসভা রাজ্যসভা হইতে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। প্রথমত, অর্থ বিল একমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা যায় এবং ১৪ দিন বিলম্ব করা ছাড়া রাজ্যসভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়ত, সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব একমাত্র লোকসভাই মঞ্জুর করিতে পারে। তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভা ইহার কাজের জন্য একমাত্র লোকসভার নিকট দায়ী।

ব্রিটেনের মত ভারতে নিম্নকক্ষ লোকসভাই অধিক ক্ষমতাশালী। তবে উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা ব্রিটেনের লর্ডস্‌ সভার মতন একেবারে ক্ষমতাহীন নয়। দুইটি বিষয়ে রাজ্যসভা লোকসভা হইতে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। প্রথমত, রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাশ করিয়া জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্টকে আইন পাশ করিবার ক্ষমতা দিতে পারে (২৪৯ নং ধারা)। দ্বিতীয়ত, একমাত্র রাজ্যসভাই প্রস্তাব পাশ করিয়া কোন নূতন সর্ব ভারতীয় কৃত্যক (All India Services) স্থাপন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দিতে পারে।

বিল পাশের পদ্ধতি ঃ যে-সব বিল পার্লামেন্ট পাশ করে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত—সরকারী ও বেসরকারী বিল। সরকারী বিল আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অর্থ বিল ও সাধারণ বিল। যে-কোন বিলকে আইনে পরিণত করিতে হইলে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাঁচটি পর্যায় অতিক্রম করিতে হয়। সাধারণ বিল নিম্নলিখিতভাবে পাশ হয় :

প্রথম পাঠ ঃ এই পর্যায়ে বিল উত্থাপনকারী বিলটির শিরোনামা পড়িয়া বিলের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন। বিলের উপর বিশেষ আলোচনা এই সময় হয় না। **দ্বিতীয় পাঠ ঃ** এই পর্যায়ে বিলটির অন্তর্নিহিত নীতি সম্পর্কে সদস্যরা আলোচনা করেন, কিন্তু কোন বিশদ আলোচনা বা সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয় না। **কমিটি পর্যায় ঃ** বিলের মূলনীতি গৃহীত হইলে উহা একটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয়। এই কমিটি বিলের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা

করিয়া পরিবর্তনও করিতে পারে। **রিপোর্ট পর্যায়ঃ** সিলেক্ট কমিটি বিলটি যে-কক্ষে উত্থাপিত হইয়াছিল রিপোর্টসহ সেই কক্ষে প্রেরণ করে। এই পর্যায়ে সদস্যগণ বিলটির ধারা-উপধারা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। যে-কোন সংশোধনী প্রস্তাব এই স্তরে আনা যায়। তাহার পর সংখ্যাধিক্য ভোটে প্রতিটি ধারার ভাগ্য নিরূপিত হয়। এইখানেই দ্বিতীয় পাঠের শেষ। **তৃতীয় পাঠঃ** পঞ্চম পর্যায় হইতেছে তৃতীয় পাঠ। এই সময় বিলটি সমগ্রভাবে আলোচনা করা হয়; দুই-একটি মৌখিক সংশোধন প্রস্তাব ছাড়া বিলের অন্য কোন পরিবর্তন এই স্তরে হয় না। কক্ষের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পাইলে বিলটি পাশ হইল বলিয়া ধরা হয়।

ইহার পর বিলটি অন্য কক্ষে প্রেরণ করা হয় এবং সেই কক্ষেও বিলটি পাঁচটি পর্যায় অতিক্রম করে। উভয় কক্ষ বিলটি পাশ করিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া বিলটি আইনে পরিণত হয়। অবশ্য উভয় কক্ষ একমত না হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন ডাকেন এবং সেখানেই বিলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অর্থ বিলের ক্ষেত্রে অবশ্য রাজ্যসভা ১৪ দিন বিলম্ব করা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা ভোগ করে না।

(জ) কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-বিভাগঃ

কেন্দ্রীয় শাসন-বিভাগ দুইভাগে বিভক্ত—(১) রাষ্ট্রপতি ও (২) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা। প্রকৃত শাসক মন্ত্রিপরিষদ এবং রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক।

রাষ্ট্রপতিঃ রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্য এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করিতে হইলে পার্লামেন্টের এক কক্ষ অভিযোগ আনয়ন করে এবং অপর কক্ষ অভিযোগের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত লয়। রাষ্ট্রপতি অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ছাড়া মাসিক ১০,০০০ টাকা বেতন পান।

ক্ষমতাঃ সংবিধানের ৫৩নং ধারা-অনুযায়ী কেন্দ্রের সমুদয় শাসন-ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হইবে এবং তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধীন কর্মচারীর দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

রাষ্ট্রপতির নামেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগ করেন, যেমন—প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, রাজ্যপাল, সুপ্রীম

কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারপতি, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, নির্বাচন কমিশনার ও অডিটার জেনারেল ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ভাষা কমিশন, আন্তঃরাজ্য কমিশন ও ফিনান্স কমিশন প্রভৃতিও তিনি গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা ভাঙিয়া দিতে পারেন। উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা করিতে পারেন। তাঁহার স্বাক্ষর ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। তাঁহার অনুমতি ছাড়া অর্থ বিল লোকসভায় উত্থাপন করা যায় না।

রাষ্ট্রপতি তিন প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। (১) ভারতের বা ইহার কোন অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে বা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা থাকিলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যাইতে পারে (৩৫২নং ধারা)। (২) কোন রাজ্যের প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইলে সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন (৩৫৬ নং ধারা)। (৩) ভারতের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম বিপন্ন হইলে অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন (৩৬০ নং ধারা)।

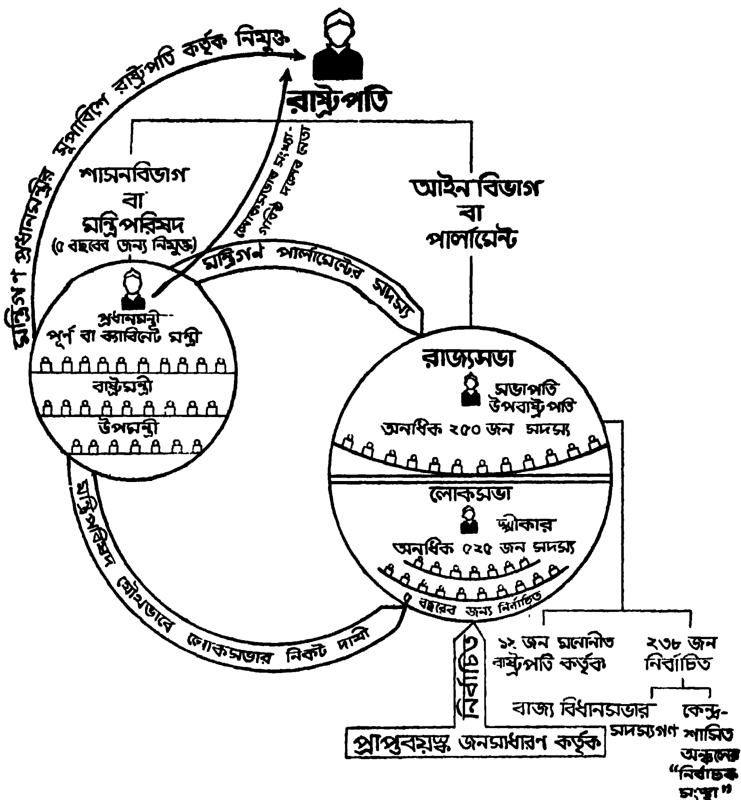
রাষ্ট্রপতির হাতে এত ব্যাপক ক্ষমতা থাকিলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। মন্ত্রিসভার পরামর্শেই সব কাজ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ : ভারতে প্রকৃত শাসক হইতেছে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ। পূর্ণমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী-রূপে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। লোকসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যে-কোন সদস্য মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারেন। পার্লামেন্টের সদস্য নন এমন কোন ব্যক্তি মন্ত্রী-রূপে নিযুক্ত হইলে ছয়মাসের মধ্যে তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভিন্ন রকম কাজ করে : (১) সরকারের নীতি নির্ধারণ করা, (২) আইন ও শাসনবিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, (৩) পার্লামেন্টের অনুমোদিত নীতি প্রয়োগ করা এবং (৪) আইন প্রণয়নে

অংশগ্রহণ করা। আইনত পার্লামেন্ট মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিলেও কার্যত মন্ত্রিপরিষদই পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় সরকার



মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে প্রধানমন্ত্রী। তিনিই প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট গঠন করেন; তাঁহার সহিত মতভেদ হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সমগ্র ক্যাবিনেটই ভাঙিয়া যায়।

তিনি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে বিভাগ বন্টন ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংহতি রক্ষা করা তাঁহারই দায়িত্ব। প্রধান-মন্ত্রী লোকসভার নেতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে দলীয় সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করেন। জাতীয় নেতা হিসাবেও প্রধানমন্ত্রীর প্রভূত মর্যাদা আছে। প্রধানমন্ত্রীকে তাই 'সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের

মধ্যে অগ্রগণ্য' বা 'তারকাবেষ্টিত চাঁদে'র সঙ্গে তুলনা করিলে কম বলা হয়। তিনি হইতেছেন সূর্য-স্বরূপ যাঁহার চারিদিকে সবকিছু ঘুরিতেছে।* অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেকখানি নির্ভর করে তাঁহার ব্যক্তিগত দক্ষতা, বুদ্ধি, সাহস ও নৈপুণ্যের উপর।

(ঝ) বিচার-বিভাগ—সুপ্রীম কোর্ট ঃ

ভারতে বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে রহিয়াছে সুপ্রীম কোর্ট। সংবিধানের ১২৪ নং ধারা-অনুযায়ী, একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাত জন বিচারপতি লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়। তবে এই ধারাটি ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ও ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে সংশোধিত হয় এবং বর্তমানে ১৩ জন সাধারণ বিচারপতি ও এক জন প্রধান বিচারপতি লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, তবে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করিবার সময় প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করেন।

বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত পদে বহাল থাকিতে পারেন, কিন্তু পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে প্রস্তাব পাশ হইলে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে অসদাচরণের অভিযোগে কোন বিচারপতিকে অপসারণ করা যাইতে পারে।

কাজ ঃ সুপ্রীম কোর্টের কাজ তিন ভাগে বিভক্ত। মূল এলাকা অর্থাৎ যে-সব ক্ষেত্রে সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে মামলা করা যায় তাহা হইতেছে (১) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ, (২) দুই বা ততোধিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ, (৩) একদিকে কেন্দ্র ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অপরদিকে এক বা একাধিক রাজ্যের বিরোধ।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল এলাকায় নিম্নলিখিত মামলাগুলি বিচার করা যাইতে পারে। হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায় যদি হাই কোর্ট এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে, বিষয়টির সহিত সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত। অবশ্য হাই কোর্ট অনুরূপ সার্টিফিকেট না দিলেও সুপ্রীম কোর্ট নিজেই আপীল করিবার অনুমতি দান করিতে পারে।

দেওয়ানী মামলায় যে-সকল ক্ষেত্রে অন্তত ২০ হাজার টাকা জড়িত, সেইক্ষেত্রে হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যাইতে

---

*The Prime Minister is not merely 'primus inter pares', nor even 'inter stellas luna minore', but he is the sun round whom all others revolve.

পারে। ফৌজদারী মামলায় হাই কোর্ট যদি নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করিয়া মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেয় অথবা নিম্ন আদালতে বিচারাধীন বিষয় নিজের হাতে তুলিয়া আনিয়া মৃত্যুদণ্ড দেয়, তাহা হইলে ঐ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যাইতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ এলাকাও আছে। রাষ্ট্রপতি আইন-সংক্রান্ত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উপর সুপ্রীম কোর্টের মতামত চাইতে পারেন। অবশ্য মতামত দেওয়া সুপ্রীম কোর্টের ইচ্ছাধীন এবং মতামত গ্রহণ করাও রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়।

সুপ্রীম কোর্ট নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাও সুপ্রীম কোর্টের আছে। অর্থাৎ আইন-বিভাগ-কর্তৃক প্রণীত কোন আইন বা শাসন-বিভাগের কোন নির্দেশ সংবিধান বিরোধী হইলে সুপ্রীম কোর্ট তাহা বাতিল করিতে পারে। এককথায় সুপ্রীম কোর্টই হইতেছে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও সংরক্ষক।

(ঞ) রাজ্যের শাসনবিভাগ ঃ

রাজ্যপাল ঃ কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যেও পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। রাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইতেছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে ভারতীয় নাগরিক ও ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। তিনি মাসিক ৫৫০০ টাকা বেতন ও অন্যান্য ভাতা পান।

রাজ্যের শাসনকার্য রাজ্যপালের নামেই পরিচালিত হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ও তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। তাঁহার স্বাক্ষর ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। তিনি রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে ও স্থগিত রাখিতে পারেন। যে-সকল রাজ্যে আইনসভা দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ ভাঙিয়া দিতে পারেন। তিনি দণ্ড মকুব, হ্রাস বা দণ্ডাদেশ সংশোধন করিতে পারেন।

রাজ্যপাল অবশ্য সব কাজই করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী। তবে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন—উপজাতি অঞ্চল ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন পরিচালনায় এবং রাজ্যের সাংবিধানিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবার রিপোর্ট দান ইত্যাদি।

মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা ঃ কেন্দ্রের মতই রাজ্যেও রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী হইতে হইলে রাজ্য আইনসভার একটি কক্ষের সদস্য হইতে হইবে। মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হইবার সময় আইনসভার সদস্য না থাকিলে, ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহাকে যে-কোন কক্ষের সদস্য হইতে হইবে, নচেৎ পদত্যাগ করিতে হইবে।

মন্ত্রিসভা ইহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রি-সভায় তিন শ্রেণীর মন্ত্রী থাকে—ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাই সরকারী নীতি নির্ধারণ করেন। আইনসভায় বাজেট পেশ করা মন্ত্রিসভার দায়িত্ব, তবে অর্থমন্ত্রীই বাজেট পেশ করেন।

কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনি পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলে রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়া যে-কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করতে পারেন। রাজ্য শাসনব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ।

(ট) রাজ্য আইনসভা ঃ

রাজ্যের আইনসভা এক-কক্ষ-বিশিষ্ট হইতে পারে, দুই-কক্ষ-বিশিষ্টও হইতে পারে। বর্তমানে ৭টি রাজ্যে দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা আছে, যেমন উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ ও জম্মু এবং কাশ্মীর। যুক্তফ্রন্টের আমলে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ বিলুপ্ত হয়। মধ্যপ্রদেশে উচ্চ-কক্ষ এখনও গঠিত হয় নাই।

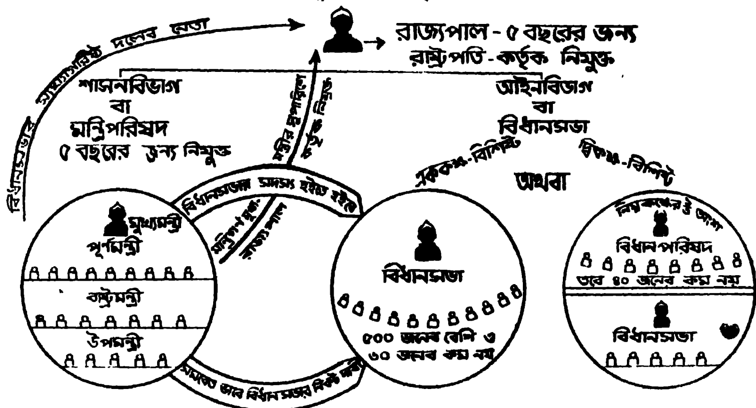
রাজ্য আইনসভার নিম্ন কক্ষের নাম বিধানসভা এবং উচ্চ কক্ষের নাম বিধান পরিষদ। কোন রাজ্যে বিধান পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা সেই রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হইবে না, তবে কোন বিধান পরিষদের সর্বনিম্ন সদস্যসংখ্যা হইবে ৪০ জন।

বিধান পরিষদের সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি দুই ৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। সদস্যদের ভারতীয় াগরিক ও ৩০ বৎসর-বয়স্ক হইতে হইবে।

সংবিধানের ১৭০নং ধারা-অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা প্রত্যক্ষ র্বাচনের মাধ্যমে জনসংখ্যার অনুপাতে বিধানসভার সদস্যগণ নির্বাচিত ইবেন। কোন রাজ্য বিধানসভায় ৫০০ জনের বেশি এবং ৬০ জনের কম

সদস্য থাকিবে না। সদস্যদের ভারতীয় নাগরিক ও ২৫ বৎসর-বয়স হইতে হইবে। সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। বিধানসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন।

রাজ্য সরকার



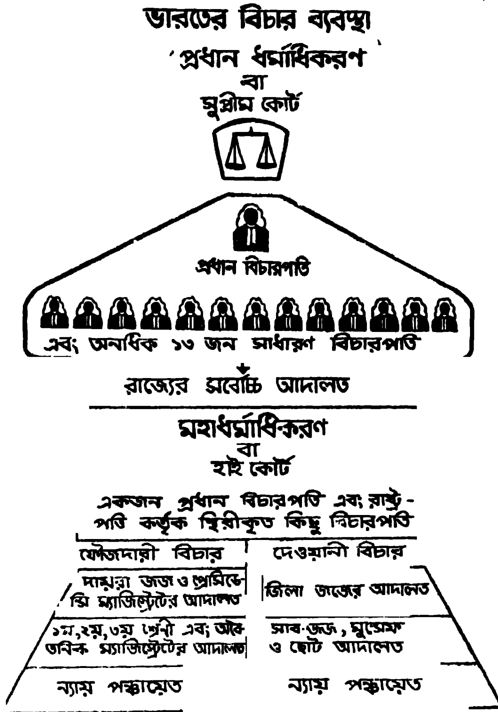
রাজ্য আইনসভার প্রথম কাজ রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়েও রাজ্য আইনসভা আইন রচনা করিতে পারে, কিন্তু পার্লামেন্ট সেই বিষয়ে আইন পাশ করিলে এবং রাজ্য আইন ইহার বিরোধী হইলে পার্লামেন্টের আইনই বলবৎ থাকিবে। দ্বিতীয়ত, আইনসভা সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ বিল যে-কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়, কিন্তু অর্থ বিল নিম্নকক্ষে উত্থাপিত হয়। বিধান পরিষদ অর্থ বিল সংশোধনও করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকেন। বিধানসভায় মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে, মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। কার্যত অবশ্য সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রিসভাই বিধানসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঠ) হাই কোর্ট ঃ

রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হইতেছে হাই কোর্ট। সংবিধানের ২১৪নং ধারা-অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া হাই কোর্ট থাকিবে। অবশ্য ২৩১নং ধারা-অনুযায়ী পার্লামেন্ট আইন পাশ করিয়া দুই বা ততোধিক রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য একটি হাই কোর্ট গঠন করিতে পারে।

একজন প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া হাই কোর্ট গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন এবং বিচারপতির সংখ্যা তিনিই স্থির করেন। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের



সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের সময় হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও পরামর্শ করেন। কোন হাই কোর্টের কাজের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে রাষ্ট্রপতি অনধিক দুই বৎসরের জন্য কয়েকজন অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত করিতে পারেন। হাই কোর্টের বিচারপতিগণ মাসিক ৩৫০০ টাকা এবং প্রধান বিচারপতি ৪০০০ টাকা বেতন পান। ইহা ছাড়া অন্যান্য ভাতাও আছে। বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর পর্যন্ত পদে বহাল থাকেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতিকে এক হাই কোর্ট হইতে অন্য হাই কোর্টে স্থানান্তরিত করিতে পারেন।

হাই কোর্টের মূল এলাকা এবং আপীল এলাকা আছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে City Sessions এবং City Civil কোর্ট স্থাপিত হওয়ায়

ঐ দুই রাজ্যের হাই কোর্টের ফৌজদারি মামলার মূল এলাকা অবলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু দেওয়ানি মামলায় এখনও মূল এলাকা আছে। মূল এলাকার অর্থ সরাসরি মামলা বিচার করিবার ক্ষমতা। কলিকাতায়ও City Civil এবং City Sessions কোর্ট আছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা সরাসরি হাই কোর্টের মূল এলাকায় বিচার হয়। দ্বিতীয়ত, ২২৬নং ধারা-অনুযায়ী হাই কোর্ট মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য কতকগুলি লেখ বা নির্দেশ (Writs) জারী করিতে পারে। তৃতীয়ত, রাজ্যের সকল নিম্ন আদালতের কাজের তদারকি করে হাই কোর্ট। চতুর্থত, সংবিধানের ব্যাখ্যা জড়িত আছে এমন কোন মামলা নিম্ন আদালত হইতে তুলিয়া আনিয়া হাই কোর্ট নিজেই বিচার করিতে পারে (২২৮নং ধারা)। পঞ্চমত, নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় হাই কোর্টে।

নিম্ন আদালত ঃ রাজ্যে হাই কোর্টের নিম্নে রহিয়াছে দেওয়ানি এলাকায় জিলা আদালত বা সেসন-জজকোর্ট। তাহার নিম্নে সাবজজ কোর্ট ও সর্বনিম্নে মুন্সেফী কোর্ট ও ন্যায় পঞ্চায়েত। ফৌজদারি এলাকায় রহিয়াছে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও তাহার নিম্নে সাবজজ কোর্ট ও পঞ্চায়েত আদালত। বড় বড় শহরে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ও ছোট আদালত রহিয়াছে।

প্রশ্নমালা

১। প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য কি? ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২। জাতীয় পতাকার বর্ণনা দাও। এই পতাকা ব্যবহারের বিধি-নিষেধ কি কি?

৩। জাতীয় সঙ্গীত মুখস্থ লিখ।

৪। ভারতের সংবিধান কি যুক্তরাষ্ট্রীয়? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

৫। ভারতীয় ইউনিয়ন কি কি অঞ্চল লইয়া গঠিত?

৬। পার্লামেন্টের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে কি জান?

৭। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে কি জান?

৮। মন্ত্রিপরিষদের কাজ কি?

৯। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে কি জান?

১০। সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১১। রাজ্যপালের ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। তিনি কি কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ভোগ করেন?

১২। বিধানসভার গঠন ও কাজ সম্বন্ধে কি জান লিখ।

১৩। হাই কোর্টের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্দেশাত্মক নীতি

(ক) নির্বাচকমণ্ডলী :

ভারতীয় ইউনিয়নে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থার পত্তন করা হইয়াছে। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে নিজেরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। তাঁহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ভারতীয় সংবিধান প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। লোকসভা ও রাজ্য বিধান-সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রতি সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে একটি নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ২১ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের সকল ভারতীয় নাগরিকের নাম এই তালিকাভুক্ত হয় (৩২৫ ও ৩২৬নং ধারা)। ইহারাই নির্বাচকমণ্ডলী। যে-সব ব্যক্তি বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত তাঁহাদের নাম নির্বাচক তালিকা হইতে বাদ যায়। লোকসভায় নির্বাচনের জন্য সমগ্র দেশকে কতকগুলি নির্বাচনী-এলাকায় ভাগ করা হয় এবং প্রতি এলাকা হইতে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কয়েকটি রাজ্য 'বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা' লইয়া এক একটি লোকসভা 'এলাকা' গঠিত হয়।

(খ) রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতি :

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে কতকগুলি নীতি পালনের জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নীতিগুলি ৩৮নং হইতে ৫০নং ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। এই নীতিগুলিকে আমরা মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করিতে পারি, যথা—রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক।

রাজনৈতিক নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে পড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, সমগ্র ভারতের জন্য একই প্রকার দেওয়ানী আইনের প্রবর্তন, শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগের পৃথক্‌করণ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভুক্ত হইল সকল শ্রমিকদের জন্য

অনুযায়ী সামরিক ও শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্য কোনরকম খেতাব রাষ্ট্র দিবে না। ভারতীয় নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের খেতাব গ্রহণ করিতে পারিবে না।

স্বাধীনতার অধিকার: সংবিধানের ১৯নং ধারা হইতে ২২নং ধারা পর্যন্ত স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। নাগরিকদের সাত প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে (১৯নং ধারা): (ক) বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিবস্ত্র সমাবেশের অধিকার, (গ) সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার, (ঘ) ভারতের যে-কোন স্থানে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করা, (ঙ) ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাস করিবার অধিকার, (চ) সম্পত্তি অর্জন, ভোগ ও বিক্রয় করিবার অধিকার এবং (ছ) যে-কোন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের অধিকার।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি অবশ্য অবাধ নয়। বিভিন্ন কারণে এই অধিকার ভোগকে রাষ্ট্র সঙ্কুচিত করিতে পারিবে। ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, শ্লীলতাহানি, নৈতিকতা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বার্থ, উপজাতির স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রয়োজনে স্বাধীনতার অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

সংবিধানের ২০, ২১ এবং ২২নং ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নির্দিষ্ট কোন আইনভঙ্গ না করিলে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যাইবে না এবং আটক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলে রাখা যাইবে না। আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আটক ব্যক্তি নিজের উকিল নিয়োগ করিতে পারিবে। কিন্তু নিবর্তনমূলক আটক আইন, মিসা এবং পি. ভি. এ. আইন পাশ হইবার ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেকখানি ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার: ভারতীয় সংবিধান বিত্তশালীদের শোষণের হাত হইতে বিত্তহীনদের সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করে নাই কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে নাগরিকদের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার দান করিয়াছে। যেমন, ২৩নং ধারা ভিক্ষাবৃত্তি, মানুষ ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যরূপ কোন বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় নিষিদ্ধ করিয়াছে। ২৪নং ধারায় ১৪ বৎসরের নিম্নে কোন বালক-বালিকাকে কারখানা, খনি বা বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে সরকার জনস্বার্থে সকলকেই কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে।

ধর্মীয় স্বাধীনতাঃ ভারতকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ধর্ম নাই, বা কোন ধর্মের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্বও নাই। সংবিধানের ২৫ হইতে ২৮নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। যে-কোন নাগরিক তাহার ইচ্ছামত ধর্মগ্রহণ, ধর্মমত প্রচার এবং উপাসনার স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। ধর্মসম্প্রদায়গুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ধর্মীয় বিষয় পরিচালনা করিতে পারিবে। তবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনস্বার্থ ও নীতিবোধের অজুহাতে ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করা যাইবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ (১) সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাইবে না। (২) কোন দাতা বা অছি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলিবে যদি অছি (Trust) বা দাতা সেই মর্মে উইল করিয়া থাকেন। (৩) আংশিক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে অভিভাবক বা ছাত্রের সম্মতি থাকিলে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাইবে।

সংস্কৃতি- ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকারঃ ভারতে নানা ভাষাভাষী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে। এই সম্প্রদায়গুলির নিজস্ব ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার সংবিধানের ২৯ এবং ৩০নং ধারায় সুনিশ্চিত করা হইয়াছে। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে, কোন সরকারী বিদ্যালয় বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলিবে না। ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং সরকার আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে এইসব বিদ্যায়তনের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না।

সম্পত্তির অধিকারঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত কি অনুচিত এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পত্তিকে সামাজিক মালিকানার অধীনে রাখা হয়। ভারতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজতন্ত্র মতবাদের মাঝামাঝি একটা আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে।

সংবিধানের ১৯ (চ) এবং ৩১নং ধারায় সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ভোগ ও বিক্রয়ের অধিকার আছে। ৩১নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে আইনের

নির্দেশ-ব্যতীত সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। জনস্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র অবশ্য কোন সম্পত্তি দখল বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে (৩১ (ক) ধারা), তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বা নীতি আইনের দ্বারা স্থির করিয়া দিতে হইবে। সংবিধান সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র এইরূপে কোন সম্পত্তি অধিকার করিলে, আদালত সেই আইন বাতিল করিতে পারিবে না বা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যথেষ্ট নয় বলিয়াও আদালতে নালিশ করা যাইবে না।

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে গোলকনাথ এবং অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্রের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন যে, মৌলিক অধিকার খর্ব করিবার অধিকার পার্লামেন্টের নাই। আদালতের এই রায়ের ফলে বিভিন্ন সংস্কারমূলক আইন রচনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই কারণে সংবিধানের ২৪তম সংশোধন করিয়া পার্লামেন্টকে মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যে-কোন অংশকে সংশোধন করিবার অধিকার দেওয়া হয় এবং ২৫তম সংশোধন করিয়া বলা হয় যে, নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকর করিবার জন্য কোন আইন পাশ করিলে, সেই আইন সম্পত্তির অধিকার খর্ব করিয়াছে এই অজুহাতে বাতিল করা যাইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকিলেও পার্লামেন্ট জনস্বার্থে আইন পাশ করিয়া তাহা সঙ্কুচিত করিতে পারিবে।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকারঃ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টকে কয়েকটি নির্দেশ বা লেখ (writs) জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (৩২নং এবং ২২৬নং ধারা)। এই লেখগুলি হইতেছে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas corpus), পরমাদেশ (Mandamus), নিষেধাজ্ঞা (Prohibition), অধিকার-পৃচ্ছা (Quo-warranto) এবং উৎপ্রেষণ (Certiorari)।

প্রশ্নমালা

১। মৌলিক অধিকার কাহাকে বলে? ভারতীয় নাগরিকের কি কি মৌলিক অধিকার আছে?

২। সাম্যের অধিকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। ভারতীয় নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকার কতখানি আছে?

৪। সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। ভারত কি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য

নাগরিক সংজ্ঞাঃ গ্রীক সভ্যতার যুগে নাগরিক শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইত। তখন যাহারা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিত তাহারাই নাগরিক বলিয়া পরিচিত হইত। রাষ্ট্রের অন্যান্য অধিবাসী যেমন—মজুর, ক্রীতদাস বা স্ত্রীলোক প্রভৃতি নাগরিক মর্যাদা হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে নাগরিকের ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা এখন অপরিহার্য নয়। যে-ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে, সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহাকেই নাগরিক বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি যথার্থই বলিয়াছেন যে, নাগরিকত্ব হইতেছে নিজের শিক্ষা-অনুযায়ী সমাজের মঙ্গলের জন্য বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ।*

নাগরিকতা অর্জনের উপায়ঃ নাগরিকতা দুইভাবে অর্জন করা যায়—(১) স্বাভাবিক ভাবে, (২) কৃত্রিমভাবে। স্বাভাবিকভাবে আবার দুইটি নীতিতে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়—রক্তের সম্পর্কে এবং জন্মস্থানের সূত্রে। যখন কোন ব্যক্তি তাহার পিতার নাগরিকত্ব পায় তখন রক্তের সম্পর্কে নাগরিকত্ব বলে। যেমন—ভারতীয় পিতার সন্তান ভারতীয় নাগরিক হইবে। আবার যে-ব্যক্তি যে-রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যেমন, এক ইংরেজ দম্পতির সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিলে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

যে-সকল রাষ্ট্রে যেমন, গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উভয় নীতিই অনুসরণ করা হয় সেখানে অনেক সময় নাগরিকত্ব নির্ণয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে নিজের পছন্দমত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বাছিয়া লয়।

*"Citizenship...means contribution of one's instructed judgement to public good."—*Laski.*

কৃত্রিমভাবে নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে সেই রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিতে হয়। সাধারণত কতকগুলি শর্ত পূরণ করিলে আবেদন অনুমোদন করা হয়। শর্তগুলি হইতেছে: (ক) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই রাষ্ট্রে বসবাস করা, (খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, (গ) রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরি করা, (ঘ) স্থাবর-সম্পত্তি ক্রয়, (ঙ) বিবাহ, (চ) সামরিক বাহিনীতে যোগদান ইত্যাদি। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজী ভাষা এবং ভারতে ২৫টি স্বীকৃত ভাষার মধ্যে যে-কোন একটি ভাষা জানিতে হয়।

সুনাগরিকতার অন্তরায়: সুনাগরিকের উপর রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু চরিত্রের কতকগুলি ত্রুটি সুনাগরিকতার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই অন্তরায়গুলি হইতেছে উদাসীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলীয় মনোভাব।

উদাসীনতা সুনাগরিকতার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। সমাজের কাজে নাগরিক যদি নির্লিপ্ত থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়, তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এই সকল ব্যক্তি ভোটদানেও বিরত থাকে বা স্বার্থান্বেষী লোকের প্রভাবে পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নাগরিককে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। নিজের স্বার্থে সে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়। এই সব ব্যক্তি উৎকোচ দান বা গ্রহণেও বিমুখ হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা হইতেই নানারকম দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ ইত্যাদি অন্যায়গুলি দেখা দেয়। দলীয় মনোভাবও সুনাগরিকতার পক্ষে অন্তরায়। দলের প্রয়োজন আছে কিন্তু দলকে জাতির ঊর্ধ্বে স্থান দিলে দেশেরই অমঙ্গল হয়।

নাগরিকের অধিকার: প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন সুখী করিবার জন্য এবং তাহার অন্তর্নিহিত গুণগুলি প্রকাশের জন্য কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা থাকার দরকার। এই সুযোগ-সুবিধা যখন রাষ্ট্র-কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়, তখন ইহাকেই অধিকার বলে। এই অধিকার ভোগের মধ্য দিয়াই ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা আসে। রাষ্ট্র-কর্তৃক স্বীকৃত এই অধিকারগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

সমাজের মঙ্গল ও সামাজিক জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সুযোগ-সুবিধাই **সামাজিক অধিকার।** জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য যে-সকল অধিকার ভোগ করা যায় তাহাই **রাজনৈতিক অধিকার**। বসবাস করিবার অধিকার, ভোটাধিকার, প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

বাঁচিয়া থাকিবার প্রাথমিক প্রয়োজন হইল অন্নসংস্থান। এই অন্নসংস্থান সুনিশ্চিত করিতে হইলে **অর্থনৈতিক অধিকার** একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে-সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেশি সেখানে দরিদ্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্থশূন্য। কিছু লোক প্রাচুর্য ভোগ করিবে, আর অবশিষ্ট লোক অনাহারে মরিবে ইহা কখনই কাম্য হইতে পারে না।* অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে কর্মের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, উপযুক্ত পরিশ্রমের উপযুক্ত মজুরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অধিকার ও কর্তব্য : অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। একটি বাদ দিয়া অপরটি কল্পনা করা যায় না। একের অধিকার ভোগ অপরের কর্তব্য পালনের উপর নির্ভরশীল। যেমন—আমার চলা-ফেরার স্বাধীনতা আমি ভোগ করিতে পারি যদি অপরে আমার এই স্বাধীনতা ভোগে বাধা না দিবার কর্তব্য পালন করে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মধ্যে থাকিয়াই সে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে। অতএব সমাজ তাহাকে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়, তাহার পরিবর্তে সমাজের সেবা করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে বলিয়াই নাগরিক কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে পারে। অতএব রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রের নিয়ম পালন করা ও কর প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। অনুরূপভাবে যে-সব সুযোগ-সুবিধা না পাইলে নাগরিক জীবন সার্থক হয় না, সেই সব সুযোগ-সুবিধা দান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত—কর্তব্যপালন ব্যতীত অধিকার ভোগ অসম্ভব।

প্রশ্নমালা

১। নাগরিকের সংজ্ঞা দাও। ২। সুনাগরিকতার পক্ষে অন্তরায় কি কি? ৩। নাগরিকদের কি কি অধিকার থাকা উচিত? ৪। "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক।"—আলোচনা কর।

* "...there must be a sufficiency for all before there is a superfluity for some."—*Laski.*

বিষয়মুখী অনুশীলনী

১। বামদিকের বাক্যাংশের সঙ্গে ডানদিকের সঠিক বাক্যাংশ যুক্ত কর :

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি	(ক) প্রকৃত শাসক।
(খ) লোকসভার সদস্যগণ	(খ) নির্বাচিত হন।
(গ) সম্পত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ	(গ) মনোনীত।
(ঘ) প্রস্তাবনা সংবিধানের	(ঘ) পৃথিবীর বৃহত্তম।
(ঙ) প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা	(ঙ) মৌলিক অধিকার।
(চ) ভারতীয় সংবিধান	(চ) পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত।
(ছ) রাজ্যপাল	(ছ) নিয়মতান্ত্রিক শাসক।
(জ) মুখ্যমন্ত্রী	(জ) কার্যকরী অংশ নয়।

২। সঠিক উত্তরে টিক্ চিহ্ন দাও :

(ক) ভারতীয় সংবিধান — এককেন্দ্রিক / যুক্তরাষ্ট্রীয় ✓ / আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়

(খ) সুনাগরিকতার পক্ষে অন্তরায় — শিক্ষা / উদাসীনতা / সম্পত্তি

(গ) কেন্দ্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী — সুপ্রীম কোর্ট / পার্লামেণ্ট / ক্যাবিনেট

(ঘ) সংবিধান চালু করা হয় — ২৬-এ নভেম্বর, ১৯৪৯ / ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ / ২৬ এ জানুয়ারি, ১৯৫০ ✓

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে শুদ্ধ বাক্যে টিক চিহ্ন দাও এবং অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধ করিয়া লিখ :

(ক) ভারতীয় নাগরিককে ১৪নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

(খ) রাষ্ট্রপতি জনগণ-কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত।

(গ) কর্মের অধিকার ভারতীয় নাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধান গণপরিষদ-কর্তৃক রচিত।

(ঙ) ক্যাবিনেট লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে।

(চ) ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

(ছ) মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ আছে।

ভারতের মুক্তি আন্দোলন

ঘটনাপঞ্জী

১৮৩৫	পাশ্চাত্য শিক্ষার পত্তন
১৮৫১	বোম্বাইয়ে প্রথম ভারতীয় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা
১৮৫৭-৫৮	সিপাহী বিদ্রোহ
১৮৫৭	কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
১৮৫৮	মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা
১৮৫৯-৬০	বাংলাদেশে নীল বিদ্রোহ
১৮৬১	ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট
১৮৬৫	উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ
১৮৬৭	বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা
১৮৬৮	পাঞ্জাব প্রজাস্বত্ব আইন
	দিল্লী হইতে আম্বালা পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন
১৮৭৬	রাজকীয় উপাধি আইন
	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা
১৮৭৭	দিল্লী দরবার
	বিলাতের মহারানী ভারতের সম্রাজ্ঞীরূপে ঘোষণা
১৮৭৮	দেশীয় সংবাদপত্র আইন
১৮৭৯	অস্ত্র আইন
১৮৮১	কারখানা আইন
	মাদ্রাজে মহাজন সভা স্থাপন
১৮৮২	হান্টার কমিশন
১৮৮৩	ইলবার্ট বিল
১৮৮৫	জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অধিবেশন
১৮৮৬	জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন
১৮৯০	বাংলা সরকার-কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেসে যোগদান নিষিদ্ধ
১৮৯১	ফ্যাক্টরী আইন

১৯৩১	গান্ধী-আরউইন চুক্তি
	ভগৎ সিংহের ফাঁসি
	গোল টেবিল বৈঠক (২য়)
	গান্ধীজীর বৈঠকে যোগদান
	কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষণা
১৯৩২	কংগ্রেসকে দমন
	গোলটেবিল বৈঠক (৩য়)
	সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা
	পুনা চুক্তি
১৯৩৪	আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার
	সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত
১৯৩৫	ভারত সংস্কার আইন
১৯৩৬	সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্যু
	অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন প্রাপ্তি ও ত্যাগ
	ষষ্ঠ জর্জের সিংহাসন লাভ
১৯৩৭	১লা এপ্রিল, প্রাদেশিক পরিষদের উদ্বোধন
১৯৩৮	কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় যোগদান'
	কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩৯	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ (সেপ্টেম্বর)
	কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও দেশে
	রাজনৈতিক অচল অবস্থা
১৯৪১	জাপানের যুদ্ধে যোগদান
	৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রমণ
	আটলাণ্টিক চার্টার ঘোষণা
১৯৪২	সিঙ্গাপুরের পতন
	রেঙ্গুন পরিত্যাগ
	ক্রীপ্‌স দৌত্য (২২-এ মার্চ হইতে ১২ই এপ্রিল)
	ব্রিটিশ সরকারের ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ
	আগস্ট বিপ্লব ও জাতীয় কংগ্রের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার
১৯৪৩	বাংলার দুর্ভিক্ষ, ৫০-এর মন্বন্তর

	নেতাজীর 'আজাদহিন্দ্ ফৌজ' 'আজাদহিন্দ্ সরকার' গঠন
	ভারতের বড়-লাট পদে লর্ড ওয়াভেল
১৯৪৪	গান্ধী-জিন্না আলোচনা
	পাকিস্তান প্রস্তাবে আলোচনা ব্যর্থ
	তাইহকুর বিমান দুর্ঘটনা
	কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তি
১৯৪৫	আজাদহিন্দ্ ফৌজের বিচার আরম্ভ
১৯৪৬	নৌবিদ্রোহ (১৮ই ফেব্রুয়ারি)
	বিলাতে পার্লামেন্টে মন্ত্রিমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা (১৯-এ ফেব্রুয়ারি)
	ক্যাবিনেট পরিকল্পনা ঘোষণা (১৬ই মে)
	অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ (১৬ই জুন)
	মুসলিম লীগ-কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র প্রস্তাব গ্রহণ (২৫-এ জুন)
	প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে মুসলিম লীগ-কর্তৃক কলিকাতায় গণহত্যা
	অন্তর্বর্তী সরকার গঠন (২রা সেপ্টেম্বর)
	অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ সভ্যদের শপথ গ্রহণ (২৬-এ অক্টোবর)
	গণ-পরিষদে যোগদানে লীগের অস্বীকৃতি (২৪-এ নভেম্বর)
১৯৪৬	গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন (৯ই ডিসেম্বর)
১৯৪৭	১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুনমাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্লিমেন্ট এট্‌লীর ঐতিহাসিক ঘোষণা
	লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের শেষ ব্রিটিশ বড়লাট রূপে নিয়োগ
	ভারত বিভাগে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা প্রকাশ
	ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ

	কাশ্মীরের ভারতে যোগদান (২৬-এ অক্টোবর)
১৯৪৮	মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু (৩০-এ জানুয়ারি)
	চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল রূপে নিযুক্ত
	হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ
১৯৫০	২৬-এ জানুয়ারি সংবিধান প্রয়োগ
	ভারতকে প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্ররূপে ঘোষণা

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিদের নাম

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ—১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতির নাম
১৮৮৫	বোম্বে	ডব্‌ল্যু. সি. ব্যানার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৮৮৬	কলিকাতা	দাদাভাই নওরোজী
১৮৮৭	মাদ্রাজ	বদর-উদ্দিন তায়েবজী
১৮৮৮	এলাহাবাদ	জর্জ ইয়ুল
১৮৮৯	বোম্বে	স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন
১৮৯০	কলিকাতা	পি. এম. মেহতা
১৮৯১	নাগপুর	পি. আনন্দ চার্লু
১৮৯২	এলাহাবাদ	ডব্‌ল্যু. সি. ব্যানার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৮৯৩	লাহোর	দাদাভাই নওরোজী
১৮৯৪	মাদ্রাজ	আলফ্রেড্ ওয়েব্
১৮৯৫	পুনা	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৬	কলিকাতা	রহমৎ-উল্লা সায়ানী
১৮৯৭	অমরাবতী	সি. শঙ্করণ নায়ার
১৮৯৮	মাদ্রাজ	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৯	লক্ষ্ণৌ	আর. সি. দত্ত
১৯০০	লাহোর	এন. জি. চন্দ্রভারকর
১৯০১	কলিকাতা	ডি. ই. ওয়াচা
১৯০২	আমেদাবাদ	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯০৩	মাদ্রাজ	লালমোহন ঘোষ
১৯০৪	বোম্বে	স্যার হেন্‌রী কটন
১৯০৫	বেনারস (কাশী)	জি. কে. গোখলে
১৯০৬	কলিকাতা	দাদাভাই নওরোজী
১৯০৭	সুরাট	ডঃ রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৮	মাদ্রাজ	ডঃ রাসবিহারী ঘোষ

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতিদের নাম
১৯০৯	লাহোর	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
১৯১০	এলাহাবাদ	স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন
১৯১১	কলিকাতা	বিষাণনারায়ণ দার
১৯১২	পাটনা	আর. এন. মুধোলকর
১৯১৩	করাচী	নবাব সৈয়দ মহম্মদ
১৯১৪	মাদ্রাজ	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯১৫	বোম্বে	স্যার এস. পি. সিন্‌হা
১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১৯১৭	কলিকাতা	অ্যানি বেসান্ত
১৯১৮	দিল্লী	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
	(বিশেষ অধিবেশন, বোম্বে)	**(সৈয়দ হাসান ইমাম)**
১৯১৯	অমৃতসর	মতিলাল নেহেরু
১৯২০	নাগপুর	বিজয় রাঘব আচার্য
	(বিশেষ অধিবেশন, কলিকাতা)	**(লালা লাজপৎ রায়)**
১৯২১	আমেদাবাদ	হাকিম আজমল খাঁ (নির্বাচিত সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ অন্তরীণ থাকায়)
১৯২২	গয়া	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯২৩	কোকনদ	মৌলানা মহম্মদ আলী
	(বিশেষ অধিবেশন, দিল্লী)	**(মৌলানা আবুলকালাম আজাদ)**
১৯২৪	বেলগাঁও	মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
১৯২৫	কানপুর	সরোজিনী নাইডু
১৯২৬	গৌহাটি	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
১৯২৭	মাদ্রাজ	মোহম্মদ আলী আন্সারী
১৯২৮	কলিকাতা	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতিদের নাম
১৯২৯	লাহোর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩১	করাচী	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
১৯৩৪	বোম্বে	বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ
১৯৩৬	লক্ষ্ণৌ	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩৬	ফৈজপুর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩৮	হরিপুরা	সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩৯	ত্রিপুরী	সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ করায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি পদে নিযুক্ত হন।)
১৯৪০	রামগড়	মৌলানা আবুলকালাম আজাদ (১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিপদ গ্রহণ)
১৯৪৬	মীরাট	আচার্য জে. বি. কৃপালনী
১৯৪৭		আচার্য জে. বি. কৃপালনী

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলগণ

লর্ড ক্যানিং	(১৮৫৮-৬২)
প্রথম লর্ড এলগিন	(১৮৬২-৬৩)
সার্ রবার্ট নেপিয়ার	(অস্থায়ী)
সার্ উইলিয়ম ডেনিসন	(অস্থায়ী)
সার্ জন লরেন্স	(১৮৬৪-৬৯)
লর্ড মেয়ো	(১৮৬৯-৭২)
সার্ জন স্ট্রেচি	(অস্থায়ী)
লর্ড নেপিয়ার	(অস্থায়ী)
লর্ড নর্থব্রুক	(১৮৭২-৭৬)
লর্ড লিটন	(১৮৭৬-৮০)
লর্ড রিপন	(১৮৮০-৮৪)
লর্ড ডাফ্‌রিন	(১৮৮৪-৮৮)
লর্ড ল্যান্সডাউন	(১৮৮৮-৯৪)
দ্বিতীয় লর্ড এলগিন	(১৮৯৪-৯৯)
লর্ড কার্জন	(১৮৯৯-১৯০৫)
লর্ড এম্পথিল	(অস্থায়ী, ১৯০৫)
দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো	(১৯০৫-১০)
দ্বিতীয় লর্ড হাডিঞ্জ	(১৯১০-১৬)
লর্ড চেমস্‌ফোর্ড	(১৯১৬-২১)
লর্ড রীডিং	(১৯২১-২৬)
দ্বিতীয় লর্ড লিটন	(অস্থায়ী)
লর্ড আরউইন	(১৯২৬-৩১)
লর্ড গসচেন	(অস্থায়ী)
লর্ড উইলিংডন	(১৯৩১-৩৬)
সার্ জর্জ স্ট্যানলী	(অস্থায়ী)
লর্ড লিনলিথগো	(১৯৩৬-৪৩)
লর্ড ওয়াভেল	(১৯৪৩-৪৭ মার্চ)
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	(মার্চ, '৪৭-১৪ই আগস্ট, '৪৭)

স্বাধীন ভারতের গবর্নর জেনারেলগণ

লর্ড মাউন্টব্যাটেন	(১৯৪৭-৪৮)
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী	(১৯৪৮ জানুয়ারি, '৫০)

প্রজাতন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতিগণ

রাজেন্দ্রপ্রসাদ	(১৯৫০-৬২)
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান	(১৯৬২-৬৭)
ডক্টর জাকির হোসেন	(১৯৬৭-৬৯)
বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি	(১৯৬৯-৭৪)
ফক্রুদ্দিন আলি আহমেদ	(১৯৭৪-)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহরু	(১৯৪৭-৬৪)
লালবাহাদুর শাস্ত্রী	(১৯৬৪-৬৫)
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী	(১৯৬৫-)

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

১। সঠিক উত্তরে '√' চিহ্নটি বসাও ঃ

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কখন প্রতিষ্ঠিত হয় ? — ১৭৯২ খ্রী:/১৮৫০ খ্রী:/১৮৫৭ খ্রী:/১৮৮৬ খ্রী:

(খ) ভারতসভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কবে স্থাপিত হইয়াছিল ? — ১৮৫৩ খ্রী:/১৮৭৬ খ্রী:/১৮৮৫ খ্রী:/১৮৫১ খ্রী:

(গ) নীল বিদ্রোহ কবে হইয়াছিল ? — ১৮৫৭ খ্রী:/১৮৫৯ খ্রী:/১৮৮২ খ্রী:/১৮৮৫ খ্রী:

(ঘ) জাতীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কবে অনুষ্ঠিত হয় ? — ১৮৭৮ খ্রী:/১৮৮৩ ১৮৮৫ খ্রী:

(ঙ) ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে কোন্ বড়লাট প্রথম ঘোষণা করেন ? — লর্ড ডালহৌসী/লর্ড বেণ্টিঙ্ক/লর্ড রিপন

(চ) ভারতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরু কে ছিলেন ? — রামমোহন রায়/দয়ানন্দ সরস্বতী/দ্বারকানাথ ঠাকুর

(ছ) ভারতসভার নেতৃপদে ছিলেন কে ? — দ্বারকানাথ ঠাকুর/রাধাকান্ত দেব/জগন্নাথশঙ্কর শেঠ/সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(জ) অস্ত্র আইন ও দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন কে বিধিবদ্ধ করেন ? — লর্ড ডালহৌসী/লর্ড রিপন/লর্ড লিটন

২। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকার নাম কি ?

(খ) বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম কি ?

(গ) কোন্ সংবাদপত্রে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ধারাবাহিক প্রকাশ করা হইত ?

(ঘ) ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের নেতা কে ছিলেন ?

(ঙ) ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের নেতৃত্ব কে বা কাহারা করেন ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। সঠিক উত্তরে ' √' চিহ্নটি বসাও ঃ

(ক) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে? — উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ এ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম/ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) কংগ্রেসের পূর্বনাম কি ছিল? — ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন/ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন/ জাতীয় সম্মেলন

(গ) কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে শাসন সংস্কার-সম্পর্কিত প্রস্তাবটি কে উত্থাপন করেন? — উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ কাশীনাথ এ্যাম্বক তেলাং/ ডি. ই. ওয়াচা

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) কংগ্রেসের তিনজন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রেসিডেন্টের নাম লিখ।

(খ) তিনজন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রেসিডেন্টের নাম লিখ।

(গ) কংগ্রেসের তিনজন সভাপতির নাম লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

১। সঠিক উত্তরে ' √' চিহ্নটি বসাও ঃ

ব্রিটিশদের জব্দ করিবাবার জন্য বিলাতী পণ্য বয়কটের সিদ্ধান্ত কে প্রথম করেন? — সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী/কৃষ্ণকুমার মিত্র

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) বঙ্গভঙ্গের ফলে যে-দুইটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল তাহাদের নাম কি?

(খ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দুইটি রূপ ছিল কি কি?

(গ) বঙ্গভঙ্গ কবে হইয়াছিল এবং কোন্ বড়লাট করিয়াছিলেন?

(ঘ) বঙ্গভঙ্গ রদ কবে হইয়াছিল এবং কে করিয়াছিলেন?

(ঙ) বঙ্গভঙ্গের সময় ছাত্রদের রাজনীতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখার জন্য কি কি সার্কুলার জারি করা হইয়াছিল?

(চ) স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাবসহ স্বরাজের কথা কংগ্রেসের কোন্ সম্মেলনে প্রথম গৃহীত হয় এবং কে ইহা উচ্চারণ করেন ?

(ছ) বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পাঁচজন নেতার নাম লিখ।

(জ) অবাঙালীদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সমর্থন করিয়াছিলেন এইরূপ তিনজন নেতার নাম লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়

১। সংক্ষেপে লিখ ঃ

(ক) তিনজন সর্বভারতীয় নরমপন্থী ও তিনজন চরমপন্থী নেতার নাম লিখ।

(খ) কোন্ অধিবেশনে কংগ্রেস কত খ্রীস্টাব্দে দ্বিধাবিভক্ত হইল ?

(গ) স্বদেশমাতার বন্ধনমোচনের জন্য কে প্রথম ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন দেন ?

(ঘ) ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান কে ছিলেন ?

(ঙ) বুড়িবালামের তীরে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাঁহারা নিহত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নায়ক কে ছিলেন ?

(চ) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কাহাকে ভারতের জঙ্গী জাতীয়তাবাদের জনকরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন ?

(ছ) চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হইয়াছিল কেন ?

(জ) কামাগাটামারু কি ?

(ঝ) কাবুলে প্রথম অস্থায়ী সরকার কাহারা গঠন করেন ?

২। '√' চিহ্নটি বসাইয়া সঠিক উত্তর দাও ঃ

(ক) মহারাষ্ট্রে গণপতি পূজা ও শিবাজী উৎসব কে প্রবর্তন করেন ?	খাপার্দে/তিলক/সাভারকার
(খ) ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্রিটিশদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা কে প্রথম বলেন ?	লালা লাজপৎ রায়/বাল গঙ্গাধর তিলক/বিপিনচন্দ্র পাল/অরবিন্দ ঘোষ
(গ) ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের পর বাংলাদেশে চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠেন।	অরবিন্দ ঘোষ/বিপিন পাল/ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে কোন্ কংগ্রেস অধিবেশনে পুনর্মিলন হয় ?

(খ) হোমরুল লীগ কাহারা স্থাপন করেন ?

(গ) কাহার ঘোষণায় হোমরুল আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়ে ?

(ঘ) অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীজী কখন শুরু করেন ?

(ঙ) অসহযোগ আন্দোলন কবে বন্ধ করিলেন এবং কেন বন্ধ করিলেন ?

(চ) স্বরাজ্য দল কে গঠন করিয়াছিলেন ?

(ছ) গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হইয়াছিল কেন ?

(জ) ভারতবর্ষের জেলে অনশন করিয়া সর্বপ্রথম কে মৃত্যুবরণ করেন ?

(ঝ) জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে কে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন ?

(ঞ) কোন্ ভারতীয় নেতা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করার মুহূর্তে 'কাইজা-ই-হিন্দ' পদক সরকারের নিকট ফেরৎ পাঠান ?

(ট) অসহযোগ আন্দোলনের সময় কে ঘোষণা করেন 'এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ আসিবে' ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। ভুল সংশোধন কর ঃ

(ক) কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জওহরলাল নেহেরু দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

(খ) ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা গান্ধী।

(গ) ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ জানুয়ারি দেশের সর্বত্র প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে পালিত হয়।

(ঘ) লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ১২ই মার্চে ডাণ্ডী অভিমুখে যাত্রা করেন।

(ঙ) খোদাই খিদমৎগার দলের নেতা ছিলেন আবুল কালাম আজাদ।

(চ) গান্ধীজী ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে আইন অমান্য অন্দোলন আরম্ভ করেন।

২। সংক্ষেপে লিখ ঃ

(ক) হরিজন কি ?

(খ) গান্ধী-আরউইন চুক্তি কি ?

(গ) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কি ?

(ঘ) ধরশনা অভিযান কি ?

(ঙ) লালকুর্তা বাহিনী কি ?

(চ) 'ক্রীতদাসত্বের নূতন দলিল' জহরলাল নেহেরু কাহাকে বলিয়াছিলেন ?

(ছ) সাইমন কমিশন ভারতে কেন আসিয়াছিল ?

সপ্তম অধ্যায়

১। × চিহ্ন সঠিক উত্তরের পাশে বসাও ঃ

(ক) স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার প্রধান কৃতিত্ব কাহার ?	✓ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের/জওহরলাল নেহেরুর/ডঃ আম্বেদকরের
(খ) ভারতবর্ষকে কত খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হয় ?	১৯৪৭/১৯৫✓০/১৯৫৬
(গ) স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে নিযুক্ত হন ?	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু/রাজাগোপাল আচারিয়া/লর্ড ✓মাউন্টব্যাটেন

২। সংক্ষেপে উত্তর লিখ ঃ

(ক) ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয় ?

(খ) মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস কবে ও কিজন্য পালন করিয়াছিল ?

(গ) দ্বিজাতি-তত্ত্বের অর্থ কি ?

(ঘ) ক্যাবিনেট মিশনের সভ্য কে কে ছিলেন ?

(ঙ) আজাদহিন্দ্ ফৌজের কয়েকটি ব্রিগেডের নাম কর।

(চ) আজাদহিন্দ্ ফৌজ কে গঠন করেন, কবে গঠন করেন ?

(ছ) সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার করে স্থাপন করেন ?

(জ) 'করেঙ্গে য়ে মরেঙ্গে' কোন্ ভারতীয় নেতা কোন্ আন্দোলন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ?

(ঝ) কংগ্রেসের সদস্যগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলি হইতে পদত্যাগ করিয়াছিল কেন ?